কাব্যের কথা

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

প্রণীত

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ইণ্ডিয়ান বুকক্লাব

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট—কলিকাতা।

১৩৩৯ সাল।

মূল্য ৷৷৹ বার আনা।

প্রকাশকের নিবেদন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সাহিত্য-জীবনের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় থাকা প্রয়োজন, কারণ চিত্তরঞ্জনের সমস্ত জীবন বৈষ্ণব কবিদিগের ভাবাতিশয্যে ভরপুর এবং তাঁহার দেশপ্রেমিকতাও সেই কাব্যপ্রীতি হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তদ্‌রচিত কাব্যসংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে করি।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ।

সূচীপত্র

কাব্যের কথা



স্তব

নমস্তে নারায়ণ !

তুমিই জীবের জীবনভূমি। সকল জীবের তুমি একমাত্র উপায়, একমাত্র অবলম্বন। আমাদের এই হাসি-অশ্রুময় জীবন, সুখেদুঃখে পরিপূর্ণ সংসার,—ইহাকে বাঁচাইয়া, জাগাইয়া রাখ একমাত্র তুমি।

তুমি ভিন্ন সকল সৃষ্টি মিথ্যা, সকল জীব মায়া-পুত্তলিকা। তুমি যখন আপনাকে লুকাইয়া রাখ তখনি সংসার মায়ার খেলা হইয়া উঠে; তুমি সৃষ্টিকে সত্য করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়াছ। সকল সংসার তোমার লীলাভূমি।

নায়কনায়িকার মাধুর্য্য, পিতামাতার বাৎসল্য, সখার সখ্য এবং প্রভু ও দাসের একদিকে স্নেহ ও অপরদিকে ভক্তি—এইসব লইয়াই ত সংসার, এইসব লইয়াই ত জীবের জীবন। তুমিই ত এই সকল রসকে সার্থক কর। সকল রসের একমাত্র লক্ষ্য তুমি; আর যাহা কিছু সব ত উপলক্ষ্য।

ওই যে মাতা বাৎসল্য-আবেগে আপনার শিশুটিকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেছেন, ঐ বাৎসল্যরস ত তোমারই দিকে

ছুটিয়া যাইতেছে। ওই শিশুর মধ্যে যে জননী শিশুরূপী তোমাকে না দেখিতে পান, তাঁহার বাৎসল্যের সার্থকতা কোথায়? তুমি যখনি তাঁহার প্রাণে ওই শিশুরূপে আবির্ভূত হও, তখনি তাঁহার বাৎসল্য ধন্য হয়। বাৎসল্যের অসীম আনন্দ তিনি তখনি উপভোগ করেন। নায়কনায়িকার যে মাধুর্য্যরস তাহাও তোমারই পানে প্রবাহিত হয়; যতক্ষণ তোমাকে খুঁজিয়া না পায় ততক্ষণ তাহার কোনও সার্থকতা হয় না। যখনি তুমি নায়কনায়িকারূপে আপনাকে প্রকাশিত কর, তখনই তাহাদের প্রেমালিঙ্গন ধন্য হয়। তাহারা হাসি-অশ্রুজলে, চুম্বনে, পরশে তোমারই মাধুর্য্যরসের অপার আনন্দ সম্ভোগ করে; সকল সখ্যের তুমি আশ্রয়, সকল দাস্যের তুমি যে প্রভু। যতক্ষণ তুমি সখারূপে প্রভুরূপে, না দেখা দাও, ততক্ষণ তাহারা "কই সখা, কই প্রভু" বলিয়া এই সংসার অরণ্যে কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তুমিই তাহাদের সখ্য ও দাস্যকে সার্থক করিয়া তুল।

সকল জীবের তুমি একমাত্র আশ্রয়, সকল নরের তুমি সমষ্টি, সকল নরসমাজের তুমি ব্যষ্টি, সকল জাতির তুমিই জাতীশ্বর। তুমিই বিশ্বমানব;—অতীত মানব তোমারই বুকে লুকাইয়া আছে, বর্ত্তমান মানব তোমারই জীবন আশ্রয় করিয়া জীবনযাপন করিতেছে; আর মানব যাহা হইবে, তাহার সমুদায় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও এক অপূর্ব্ব অসংখ্যদল পদ্মের মত তোমারই বক্ষে ফুটিয়া আছে। তুমি দেহ, তুমিই আত্মা; তুমি সাধনা, তুমিই সিদ্ধি; অনাদি তুমি, আদি তুমি, অনন্ত তুমি, সান্ত তুমি। তুমিই নরনারায়ণ।

তুমি যেমন জীবের অবলম্বন, জীবও যে তেমনি তোমার অবলম্বন। প্রভো! জীব ছাড়াও তোমার চলে না। লীলা-প্রয়োজনহেতুই ত তুমি জীবকে তোমার বক্ষ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া দিলে। সে

জীব ছাড়া তোমার লীলা সম্ভব হয় না। তুমি নিত্যই এক, আর নিত্যই দুই হইয়া আপনার মধ্যে লীলা কর। তুমি এক হইয়াও লীলরসে বিভোর হইয়া অনন্তরূপ ধরিয়া বিশ্বসংসারে বিচরণ কর। তুমি যখনি তোমার বিশ্ববীণায় ঝঙ্কার দেও তখনি সকল বিশ্বের কবি গান গাহিয়া উঠে। কা'র সে সঙ্গীত, প্রভো! তুমি ছাড়া কেহ তাহা সম্ভোগ করে। তুমি পিতা হইয়া, মাতা হইয়া স্নেহদান কর,—আবার তুমিই সন্তান হইয়া সে স্নেহের দাবী কর। তুমি প্রভু হইয়া দাসকে স্নেহে আবদ্ধ কর, আবার তুমিই দাস হইয়া প্রভুকে প্রাণের ভক্তি অর্পণ কর। তুমি সখা হইয়া সখ্যরস ঢালিয়া দাও, আবার তুমিই সে রস সম্ভোগ কর। তুমি ধনী হইয়া দান কর, ভিখারী হইয়া গ্রহণ কর। তুমিই নায়কনায়িকা হইয়া প্রেমলীলার অভিনয় কর। তুমিই তাহাদের বাহুপাশ হইতে আলিঙ্গন কাড়িয়া লও, তাহাদের ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে প্রেমচুম্বন চুরি করিয়া আস্বাদ কর।

সকল ভোগ্যের তুমি ভোক্তা, সকল রসের তুমিই আস্বাদনকারী। আমাদের সকল কর্ম্মের তুমি কর্ত্তা, সকল ধর্ম্মের তুমি ধাতা, সকল বিধির তুমি বিধাতা। অনন্ত তোমার লীলা, হে অনন্তরূপী নারায়ণ! তোমার কথা যখন ভাবি, অতীতের সমস্ত যবনিকা উত্তোলিত হয়, তখন বুঝিতে পারি ইতিহাস শুধু তোমারই লীলাপরিপূর্ণ পুণ্য কাহিনী। সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব আর তুমি, তুমি আর জীব। তুমি এক, তুমিই দুই—এই দুই মিলিয়াই তুমি এক। ইহাই বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য। ইহাতেই বিশ্বের নিখিল রস-স্ফূর্ত্তি। ধন্য জীব, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার লীলা!

নমস্তে নারায়ণ!

কবিতার কথা

আজকাল বঙ্গসাহিত্যে একটা গোল বাধিয়াছে। আমি ভাষার কথা বলিতেছি না, সাহিত্যেরই কথা বলিতেছি। এই সাহিত্য বিষয়ে, বিশেষতঃ গীতিকাব্য লইয়া, নানাপ্রকারের তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন আধুনিক বাঙ্গালা কবিতায় প্রত্যক্ষ-বাস্তবতার অভাব। আবার কেহ কেহ বলেন ভাবুকতাই মনুষ্যজীবনের সারাংশ। এই ভাবুকতা ছাড়িয়া দিলে কবিতা ফুটিবে কি করিয়া? প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজি সাহিত্যে Realism ও Idealism লইয়া যে তর্কবিতর্ক চলিত, ইহা কতকটা সেই প্রকারের তর্ক। ইংরাজি সাহিত্যে ইহার একটা মোটামুটি রকমের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এই মীমাংসা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Skylarkএর শেষ দুইটি ছত্রে আছে।

Type of the wise who soar but never roam
True to the kindred points of Heaven and Home!

অর্থাৎ সংসার ও পরমার্থ, প্রত্যক্ষরাজ্য ও ভাবরাজ্য—এই দু'য়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই কি আমাদের কবিতার আদর্শ? একটু ভাবিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে আমাদের প্রাণের মাঝে দুইটা ভাব সর্ব্বদাই দেখা দেয়। একটা আমাদের মাটি আঁকড়াইয়া থাকিতে বলে, আর একটা আমাদের মাটি ছাড়াইয়া আকাশের দিকে তুলিয়া ধরে। এই সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, এই দুই লইয়াই আমাদের জীবন। ইহাদের কোনটাকেই আমরা একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারি না। ছাড়িয়া দিলে, মনুষ্যজীবন বলিলে যাহা বুঝায় তাহার অঙ্গহানি হয়।

মনুষ্যজীবন কি? আমরা প্রতিদিন যেমন করিয়া জীবনযাপন করি তাহাই কি প্রকৃত জীবন? আমরা সকলেই সকালে উঠিয়া যে যার কর্ম্মে নিযুক্ত হই, সমস্তদিন কর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসি এবং তৎপরে বিশ্রাম করি। যাহার কর্ম্ম করিতে হয় না সেও শয্যা হইতে উঠিয়া কোন রকম গল্প করিয়া, তামাক টানিয়া দিনটা কাটাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা আমাদের জীবনের বহিরাবরণ। ইহার আর একটি দিক আছে। তাহাকে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতি বলা যাইতে পারে। যে সমস্তদিন কর্ম্ম করিয়া কাটায়, সেও মাঝে মাঝে, ভাবিতে ভাবিতে, তাহার কর্ম্মের সার্থকতা যেখানে, সেই রাজ্যে গিয়া পৌঁছায়। যে সমস্ত দিন আলস্যে অতিবাহিত করে, সেও একেবারে অসার না হইলে:মাঝে মাঝে দূরাগত বংশীধ্বনি শুনিতে পায়, আর সেই বংশীরবে সে আর একটা রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়। এই সব মুহূর্ত্তগুলি জীবনের অনন্তমুহূর্ত্ত। এই মুহূর্ত্তেই আমরা প্রকৃত জীবনযাপন করি এবং আমাদের ও অপরের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সার্থকতা বুঝিতে পারি। কৃষকের জীবন লইয়া সেই কবিতা লিখিতে পারে, যে কৃষকের জীবনের সার্থকতা বুঝিয়াছে। কেমন করিয়া কৃষক প্রাতে উঠিয়া পান্তা ভাত, খাইয়া লাঙ্গল লইয়া মাঠে যায় কেমন করিয়া সে চাষ করে, সে চাষ করিতে করিতে কি গান গায়, সে বাড়ী ফিরিয়া কেমন করিয়া বিশ্রাম করে, কি খায়, কি পরে—এই সব খুব জাঁকাল রকমের ভাষায় বর্ণনা করিলেও কবিতা হয় না। কেবল একখানি সুন্দর আলোক-চিত্র হয়।

আজকালকার দিনের অনেক কৃষক-বিষয়ক কবিতা এই প্রকারের। এই সব কবিতায় প্রত্যক্ষ-বাস্তবতা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বস্তুতন্ত্রতা নাই,—যাহা লইয়া কৃষকের জীবনের সার্থকতা, তাহার কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। কৃষক বুঝুক আর নাই বুঝুক, তাহার

দৈনন্দিন জীবনের বাহিরে একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই অন্তঃপ্রকৃতির অনুভূতি যার নাই, সে কখনই কৃষকের জীবনকে আপনার করিয়া লইতে পারে না। সে যাহা বুঝে ও যাহা ধরে, তাহা বাহিরের খোসামাত্র। সেই খোসা লইয়া যাহা লেখা যায়, তাহা কবিতা নয়। যে কবি সেই জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান পাইয়া, সেই জীবনের ভিতর ও বাহির দুই দিককেই সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারেন, তিনিই যথার্থ কৃষকের কবিতা লিখিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বার্ন্‌সের Ploughmanএর কথা বলা যায়। আধুনিক বাঙ্গলা কবিতায় কালিদাস বাবুর "পর্ণপুটে" কৃষকের ব্যথা নামক একটী কবিতা যথার্থ কৃষকের কবিতা—

ক্ষেতের কাজ করতে গিয়ে উদাস হয়ে যাই
কাজেতে আর নাইক মন, আরামে সুখ নাই।
তোমার সেই কাজল চোখ মনে যে উঠে জ্বলি,
ধানের চারা উপ্‌ড়ে ফেলি আগাছা কাটা বলি'।

* * * *

শান্তিপুরে,' তোমার ডুরে,' এবুকে চাপি ধরি,
চোখের জলে বক্ষ ভাসে মেজেতে রহি পড়ি।

কৃষকের কবিতার বিষয় যাহা বলিলাম, সব কবিতার বিষয়েই তাহা খাটে। শুধু নায়ক নায়িকার হাবভাব বর্ণনা করিলেই প্রেমের কবিতা হয় না। প্রেমের রাজ্যে যে না পৌঁছিতে পারে, তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা বিড়ম্বনামাত্র। আমাদের প্রত্যেক প্রত্যঙ্গের, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সকল বহিরাবরণের মধ্যে এই অন্তঃপ্রকৃতির অনুসন্ধানই মনুষ্যজীবন। সকলেই সেই একই অনুসন্ধান করিতেছে। কেহ জ্ঞানে করে, কেহ না বুঝিয়া

করে। আমরা সকলেই সেই অন্তঃপ্রকৃতির—সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। যাহাকে জীবনের অনন্তমুহূর্ত্ত বলিলাম, সেই অনন্তমুহূর্ত্তে সেই প্রাণেরই সাক্ষাৎলাভ হয়। আর সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয় মন রসোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া পড়ে। তখন কবিতার সৃষ্টি হয়।

তবে কবিতার রাজ্য কোথায়? আমি পণ্ডিত নহি, কথা লইয়া তর্ক করার অভ্যাস নাই। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সে দিন হিমালয়ে যে দৃশ্য দেখিলাম তাহারি কথা বলিব। ধরণী অনেক উপরে উঠিয়া আকাশের গায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। আকাশ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। ধরণী আকাশের গায় ও আকাশ ধরণীর গায় মিলাইয়া গিয়াছে। এ মিলন অপূর্ব্ব, গভীর, অনন্ত! দেখিয়া দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। মনে মনে নমস্কার করিলাম, বলিলাম এই ত জীবন। এইখানে সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, দেহ ও আত্মা, বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এই সেই মিলনভূমি অপূর্ব্ব, অনন্ত! বুঝিলাম, যাহা আত্মা, তাহাই দেহ, যাহা অনন্ত তাহাই সান্ত, যাহা পরমার্থ তাহাই সংসার।

জীবন এই মহামিলনমন্দির। ইহাই কবিতার রাজ্য। এখানে শুধু সংসার নাই, শুধু পরমার্থও নাই, শুধু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বাস্তবতা নাই, বস্তুহীন কল্পনাও নাই—যাহা আছে তাহাই জীবনের স্বরূপ! এ জীবন লইয়াই কবিতা! যে শুধু ছোবড়া খায় সে কখনও ফলের স্বাদ পায় না। যে জীবনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান না পায়, সে কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আর যে ছোবড়া না ছাড়াইয়া ফল খাইতে চায়, সেও ফলের স্বাদ পায় না। সে জীবনের

অন্তঃপ্রকৃতির একটা মনগড়া কল্পিতলোক সৃজন করে মাত্র। শূন্য আকাশে যেমন গৃহনির্ম্মাণ করা যায় না, সেইরূপ কল্পিত-লোকে কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এই কল্পিত-লোকের কোন সত্তা নাই। এ মিলনমন্দির সত্য। সত্যকে ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় না।

আমি দু'একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমার কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কৃষ্ণপ্রেমে মজিয়া যখন রাধিকা কুলমানের কথা ভাবিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—

"অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি"—

কবি তখন একেবারে রাধিকার মনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া সেই মহামিলনমন্দিরে প্রবেশ করিলেন—

"কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি।
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়ে যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঞি!"

আজকাল এরূপ কবিতা শুনিতে পাই না! আর কি শুনিতে পাইব না?

রাধিকার পূর্ব্বরাগের কথা মনে করুন!

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম?
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।

এও সেই মহামিলনমন্দিরের গীতধ্বনি! যাঁহারা শুধু বাহিরের দিকটা দেখেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন, "পূর্ব্বরাগে আবার মিলন আসিল কোথা হইতে?" আমি যে মহামিলনের কথা বলিতেছি তাহাই যে জীবনের স্বরূপ,—পূর্ব্বরাগ, মিলন, সম্ভোগ, বিরহ ইত্যাদি সেই স্বরূপেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সুতরাং পূর্ব্বরাগের গীতই হউক, কি মিলন অথবা বিরহের গীতই হউক, জীবনের সকল গীতই সেই মহামিলনমন্দিরে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। যিনি যথার্থ কবি, তিনি সেই মন্দিরে পৌঁছিয়া তাহারি গান বুকে করিয়া বহন করিয়া আনেন। তাই আজ এত বৎসর পরেও এই কবিতাটি পড়িলেই মনে হয়—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ!

চণ্ডীদাস যে সাধক ছিলেন। তিনি যে নামের মাহাত্ম্য বুঝিতেন। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে নায়ক-নায়িকার নাম লইয়া লিখিত দুইটি কবিতা আমার মনে পড়িতেছে। একটি এই—

শুনেছি শুনেছি কি নাম তাহার—
শুনেছি শুনেছি তাহা
নলিনী নলিনী নলিনী নলিনী
কেমন মধুর আহা!
নলিনী নলিনী বাজিছে শ্রবণে
বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম,

কভু আনমনে উঠিতেছে মুখে
নলিনী নলিনী নলিনী নাম।
বালার খেলায় সখীরা তাহারে
নলিনী বলিয়া ডাকে
স্বজনেরা তায়, নলিনী নলিনী
নলিনী বলে গো তাকে!
নলিনীর মত হৃদয় তাহার
নলিনী যাহার নাম!

আর একটি এই—

ভালবেসে সখি! নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিয়ো তোমার
চরণ-মঞ্জীরে!

বলা বাহুলা, চণ্ডীদাসের কবিতা যে রাজ্যের, এ দুটি কবিতা সে রাজ্যেরই নয়—সে মহামিলনমন্দিরের অনেক দূরে।

প্রেমে ডগমগ-হৃদি রাধিকা নিজের অবস্থা নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না। সে ভাবিতেছে তাহার কি হইল। সে যেন সংসারে থাকিয়াও সংসারে নাই। সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, অথচ প্রেমের যে প্রভাব তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে,—

সই! পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,
না জানিয়ে রাত দিন॥

পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ, পিরীতি মুরতি
কেবা করে পরতীত।
পিরীতি মন্তর, জপে যেই জন,
নাহিক তাহার মুল।
বন্ধুর পিরীতি, আপনা বেচিনু
নিছি দিনু জাতিকুল।
সে রূপ সায়রে, নয়ন ডুবিল
সে গুণে বাহিল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবল যে চিতে
নিবারিব কি না দিয়া।
খাইতে খেয়েছি, শুইতে শুয়েছি
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
অনল দিয়ে দুয়ারে।

রাধিকার হৃদয়দর্শী চণ্ডীদাস, রাধিকার হৃদয়ের কথা সকলই জানেন। সংসারে থাকিয়াও যে সে সংসারের বহুদূরে তাহা তিনি জানেন। তাই তিনি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ আছয়ে ঘরে বটে, কিন্তু ইঙ্গিত পাইলে অনল দিয়ে দুয়ারে"। আর একটি কবিতাতে কবি বলিতেছেন, "তোমার এ রকম ত হবেই। তুমি যে—

পিরীতি নগরে বসতি করেছ
পরেছ পিরীতি বাস।"

তারপর :মিলনের ও সম্ভোগের কথা। মিলনের মাঝে রাধিকা বলিতেছে—

কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু
শ্যাম কাল কি গোরা!

এ ত শুধু বাহিরের সঙ্গীত নহে, এ যে অন্তর্দৃষ্টি পরিপূর্ণ! শ্যামের প্রেমে গদগদ-প্রাণ রাধিকা এ কোন শ্যামের অনুসন্ধান করিতেছে? চণ্ডীদাস জানে; রাধিকা না জানিলেও তাহার হৃদয় জানে। তাই সে মিলনের মধ্যেও গাহিয়া উঠিল।

কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু
শ্যাম কাল কি গোরা!

প্রত্যেক মিলনের মধ্যেই একটা বিরহ প্রচ্ছন্ন থাকে। এ গান তাহারি প্রথম সূত্র। এই বিরহ তারপর সম্ভোগে আরও সুন্দরভাবে, গভীরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

ইহার পরের অবস্থাই বিদ্যাপতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝিনু কৈছন কেলি।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।

কেমন করিয়া নয়ন তিরোপিত হইবে, নয়ন যে অতৃপ্য! কেমন করিয়া প্রাণ জুড়াইবে, প্রাণ যে জুড়াইবার নয়! আমরা যে ইন্দ্রিয় দিয়া অতীন্দ্রিয়কে ধরিতে চাই। তাই প্রত্যেক মিলনের মধ্যে মহা-মিলনের অনুসন্ধান করি, তাই সম্ভোগেও এক মহাবিরহের ছায়া পড়ে, তাই সম্ভোগ-মিলনের মধ্যেও নায়িকা গাহিয়া উঠিল—

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি!

এই কবিতা গুলি Realisticও নয় Idealistic নয়; আমি যে মহামিলনমন্দিরের কথা বলিয়াছি তাহারি ধ্বনি। এগুলি জীবনের কবিতা, ইহাতে জীবনের ধ্বনি পাওয়া যায়। তাই আমরা এ কবিতাগুলিকে কিছুতেই ভুলিতে পারি না।

ইহাই হিন্দুর আন্তরিক ভাব। ইহাই বাঙ্গালী কবিতার প্রাণ। বঙ্গসাহিত্যে—চণ্ডীদাস হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও নিধুবাবু পর্য্যন্ত—এই কবিতার একটা অক্ষুণ্ণ ধারা দেখিতে পাওয়া যায়!

সে ধারা কোথায় লুকাইয়া গেল? আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাই না কেন? ইউরোপীয় সাহিত্যে মন ডুবাইয়া দিয়া আমরা কি শেষে বাঙ্গালা কবিতার যে প্রাণ তাহাই হারাইয়া ফেলিব? আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের একথা ভাল লাগিতেছে না। তাঁহারা হয় ত বলিবেন, কবিতা কি চিরকাল এক রকমেরই থাকিবে? আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের পরিসর বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং কবিতাকে সেই পুরাতন গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া দিলে কেমন করিয়া চলিবে? কিন্তু আমি ত কোন গণ্ডীর

কথা বলি নাই, আমি কবিতার রাজ্যের কথা বলিয়াছি, কাব্য-লোকের কথা বলিয়াছি। এই কাব্য-লোকের কোন সীমা নাই। এ রাজ্য অসীম, অনন্ত। জীবনের পরিসর যদি বাস্তবিকই বাড়িয়া থাকে, কবিতার বিষয়ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইব্‌সেন হইতে কাড়াকাড়ি করিয়া কবিতার বিষয় সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে। নানা ফুলে মধুপায়ী ভ্রমরের মত মেটার্‌লিঙ্কের পত্রে পত্রে মধু আহরণ করা চলিতে পারে। আমরা সে বিষয়-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া কবির নৈপুণ্যেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিতে পারি। কিন্তু কবি যদি সেই কাব্যলোকে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তাঁহার কবিতা বৃথা। একদিনে তাহা লোকের মন চমকাইয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহা চির-দিনের জিনিস নহে। বিষয় যাহাই হউক না কেন, কবির অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই, সেই মহামিলনমন্দিরের সাধক হওয়া চাই। সে অন্তঃপ্রকৃতির সাক্ষাৎ দর্শন আবশ্যক। সে মন্দিরে যে সঙ্গীত-স্রোত চিরকাল প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে অবগাহন করা চাই—ভাসা চাই—ডুবা চাই! নতুবা দূরে দাঁড়াইয়া; বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মনগড়া, কল্পিত ভাবরাশি খুব ওস্তাদী রকমের ছন্দে প্রকাশ করিলেও কবিতা হয় না।

বাঙ্গলা কবিতার সেই সরল সত্য প্রাণ আমরা হারাইতে বসিয়াছি বলিয়াই আমাদের কবিতার ভাষা ও ধরণ ক্রমশঃ কিম্ভুত-কিমাকার হইয়া আসিতেছে। আজকালকার দিনে!

এই হিয়া দগ্‌দগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল—

এই ভাবটি প্রকাশ করিতে হইলে নানারকম উপমার আবশ্যক হয়। ইহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছানিয়া বুনিয়া ফেনাইয়া ফেনাইয়া বলিতে হয়। তা' না হইলে নাকি কবিতা হয় না। আজকাল আমরা সবাই

খেলোয়াড়। কবিতা লিখিতে গিয়া খেলিতে বসি। একটি ভাব কোন রকমে জোগাড় হইলেই তাহাতে ভাষার রং মাখাইতে বসি এবং সেই রঙ্গিন জিনিসটাকে লইয়া, বল খেলার মত তাহাকে আছড়াইয়া আছড়াইয়া খেলিতে থাকি। কবির হৃদয় হইতে কোন ভাবই সহজে, সরল ভাবে, পাঠকের মনে আসে না। কবি যেন তাহাকে তাঁহার মন হইতে নামাইয়া মাঠে ফেলিয়া তাহার সঙ্গে খেলা করেন, আর সেই অবসরে পাঠকেরা একটু একটু দেখিয়া লয়, আর কবির ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে।

কিন্তু ইহা ত বাঙ্গলা কবিতার ধরণ নয়। যে পরিমাণে প্রাণের অভাব হয়, সেই পরিমাণেই ধরণের মাত্রা বাড়িয়া যায়। বাঙ্গলা কবিতার ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে। তাই আজকাল বাঙ্গলা কবিতাতে আন্তরিকতার এত অভাব ও ধরণের এত বাড়াবাড়ি।

সেই সোজা সরল ধরণের দুই একটি কবিতা মনে পড়িতেছে। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা ঐ ভাষায়ই লিখিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কবিতায় অনুপ্রাসের বাহুল্য থাকিলেও তাঁহার ভাষা ও ধরণ অনেকটা সেই প্রকার সহজ, সরল, প্রাণময়—

কি হেরিব শ্যামরূপ নিরূপম
নয়ন ত মম মনোমত নয়।
যখন নয়নে নয়ন, মন সহ মন
হতেছিল সম্মিলন ;
নয়ন পলক দিলে, সেই সুখের সময়!

ইহাতে খেলিবার চেষ্টা নাই,—ইহার গতি সরল! আবার দেখুন,—

মন যে আমার পড়েছে সই উভয় সঙ্কটে।

এক কর্ণ বলে, আমি কৃষ্ণনাম শুনিব,
আর এক কর্ণ বলে, আমি বধির হয়ে র'ব।
এক নয়ন বলে, আমি কৃষ্ণরূপ দেখি,
আর এক নয়ন বলে, আমি মুদিত হয়ে থাকি।
এক করে সাধ করে, ধরে কৃষ্ণ করে,
আর এক করে, করে করে নিষেধ করে তারে।
এক পদে কৃষ্ণপদে যাইবারে চায়
আর এক পদে, পদে পদে বারণ করে তায়।

রাধিকা কৃষ্ণবিরহে অজ্ঞান। সখীরা তাহার কানে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিল। অমনি রাধিকার কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি!

বহুদিন পরে মোরে মনে করে
এসেছিল ঘরে বঁধু যে আমার।
আমি জান্‌লাম জান্‌লাম—
বঁধুর শ্রীঅঙ্গের গন্ধে পশি নাসারন্ধ্রে
মৃতদেহে কর্‌লে জীবন সঞ্চার।
সখি! আমি ছিলাম অচেতনে,
ভাল, তোরা ত ছিলি চেতনে,
হায় হায়! যতনে রতনে, পেয়ে নিকেতনে,
কেন অযতনে হারালি আবার।

এইরূপ ভাষা এখন আর শুনিতে পাই না। নিধুবাবুর "তোমারি তুলনা প্রাণ তুমি এ মহীমণ্ডলে", কিম্বা বিহারীলালের—

"নয়ন অমৃতরাশি প্রেয়সি আমার!"

এইরূপ অনেক কবিতা বঙ্গভাষার আদরের সামগ্রী।

আজকালকার কবিতা পড়িলে মনে হয় যেন আমাদের ভাব, ভাষা,

ধরণ, সব বদলাইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের ভাষা অন্ত প্রকারের, আমরা প্রত্যেক কথাই এত ঘুরাইয়া বলি যে সাদাসিধে লোকে বুঝিতে পারে না। আমাদের ছন্দের এখন সাপের মতন বক্রগতি। তা'র ঝঙ্কারে এত প্রকারের রাগরাগিণী-আলাপ থাকে যে, যাহার যথেষ্ট সুরবোধ আছে সে ভাব বেচারাকে একেবারেই আমল দেয় না, আর যে হতভাগ্যের যথেষ্ট সুরবোধ নাই সে অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়িতেই পারে না।

আমাদের কবিতার এই শোচনীয় অবস্থার হয় ত যথাযথ কারণ আছে। যাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাসে সুপণ্ডিত তাঁহারা বলিতে পারেন। কিন্তু যথেষ্ট কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে ত মন মানে না! প্রাণ যে চায় সেই বৈষ্ণব কবিদিগের সব-জুড়ান সুধাস্রোত। মন যে চায় সেই বাঙ্গালীর কবিতা। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জলকে সত্য করিতে হইলে বাঙ্গালীর কবিতাকে পুনর্জ্জীবিত করিতেই হইবে। কবিতা লইয়া আর খেলাধূলা ভাল লাগে না। সংসারের খেলাঘরে খেলিতে খেলিঁতে যাহারা প্রাণের বস্তুর সাক্ষাৎ পায় তাহারা বাস্তবিকই ধন্য। কিন্তু যাহারা প্রাণের বস্তু লইয়া খেলা করিতে বসে তাহাদের মত দুর্ভাগ্য আর কার? বঙ্গসাহিত্যের সেই হারাণ ধারাকে আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সে মরে নাই, একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই,—সরস্বতী নদীর মত বালুকারাশির মধ্যে লুকাইয়া আছে। সেই বালি খুঁড়িয়া তাহাকে বাহির করিতে হইবে।

আমি পণ্ডিত নহি, দার্শনিকও নহি, কিন্তু আশৈশব সাহিত্যসেবার চেষ্টা করিয়াছি। ইউরোপীয় বড় বড় লেখকেরা আজকাল কি লেখেন, আমি হয় ত ভাল করিয়া জানি না। হয় ত আমার বুঝিবার ক্ষমতাই নাই। কিন্তু বাঙ্গলা কবিতার যথার্থ প্রাণ কি, তাহা আমি বুঝি ও

কতকটা জানি। তাহারি গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমার হাতের কলম কেহ কাড়িয়া লয় নাই, সত্য। কিন্তু আমি ত সাধক নই, সাহিত্যমন্দিরপ্রাঙ্গণে সামান্য কিঙ্কর মাত্র। সেই গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার ক্ষমতা আমার নাই। যাঁহাদের আছে তাঁহাদের দুর্ভাগ্য যে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী!

আজ পরিণত বয়সে ওপারের কথাই বেশী মনে হয়। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের কবিতামন্দিরে আমি যাহাকে বাঙ্গলা ক.বতার প্রাণ বলিলাম, আবার তাহারই প্রতিষ্ঠা হইবে। আমি দেখিব না, কিন্তু সেই গৌরবের আভাস আমার প্রাণকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে। আমি যেন চক্ষে সব স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। দূরাগত সঙ্গীতের ন্যায় সেই মহামিলনমন্দিরের ধ্বনি আমার কানের ভিতর দিয়া প্রাণে প্রাণে প্রবেশ করিতেছে।

আবার সেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইবে। সকল সাহিত্য সেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

বাঙ্গলার গীতিকবিতা।

বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য, যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অজ্ঞানে, অধর্ম্মে, স্বাধীনতায়, পরাধীনতায় সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। সে যে বাঙ্গলার প্রাণ, বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জল, সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। বাঙ্গলার ঢেউ খেলান শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধু-গন্ধ-বহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপ ধুনা জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মতন কুটীর প্রাঙ্গণ, বাঙ্গলার নদ নদী, খাল বিল, বাঙ্গলার মাঠ, বাঙ্গলার ঘাট, তালগাছ ঘেরা বাঙ্গলার পুষ্করিণী, পূজার ফুলে ভরা গৃহস্থের ফুলবাগান, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার তুলসীপত্র, বাঙ্গলার গঙ্গাজল, বাঙ্গলার নবদ্বীপ, বাঙ্গলার সেই সাগর-তরঙ্গে চরণ-বিধৌত জগন্নাথের শ্রীমন্দির, বাঙ্গলার সাগর-সঙ্গম, ত্রিবেণী-সঙ্গম, বাঙ্গলার কাশী, বাঙ্গলার মথুরা-বৃন্দাবন, বাঙ্গালীর জীবন, আচার-ব্যবহার, বাঙ্গলার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে, সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ! এই সবই যে সেই প্রাণ-ধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে, দুলিতেছে।

সেই প্রাণ-তরঙ্গে একদিন অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল, এক অপূর্ব্ব অসংখ্য-দল পদ্মের মত বাঙ্গলার গীতিকাব্য! কিন্তু ফুল ত একদিনে ফুটে না। তাহার ফুটনের জন্য যে অতীতের অনেক আয়োজন আবশ্যক। তাহার প্রত্যেক দলের মধ্যে যে অনেক গান, অনেক কথা, অনেক কাহিনী। তাহার গন্ধের মধ্যে যে অনেক কালের অনেক স্মৃতি, অনেক মধু জড়াইয়া থাকে। তাহার ডাঁটায় যে জন্ম-জন্মান্তরের চিহ্ন লুকান থাকে। ফুল যে অনন্তকাল ধরিয়া ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়া উঠে।

বাঙ্গলার গীতিকাব্য যে কখন্ কোন্ আদিম উষায় ফুটিতে আরম্ভ করিল, আমি জানি না। শুনিয়াছি, সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত পুরাতন বৌদ্ধ দোঁহায় তাহার উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডিদাসের সময় সেই গীতিকাব্যের বিকশিত অবস্থা। কিন্তু তার আগে অনেক গীতি-কাব্য না লেখা হইয়া থাকিলে এরূপ কবিতা সম্ভব হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। আজকাল আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান, অনেক আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে। আশা করি, একদিন আমরা আমদের গীতিকাব্যের এই হারাণ ধারাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব।

চণ্ডিদাসের লিখিত গীতিকাব্য, ইহাই বাঙ্গলার যথার্থ গীতিকাব্য; এই কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, তাহাই বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাণ। বাঙ্গলা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, রূপে এ বিচিত্র ভুবন ভরিয়া আছে। কত কাল, কত যুগ, কোন্ অন্ধকারের অন্ধকারে রূপের ধ্যানে মগ্ন আমার বাঙ্গলা জাগিয়া দেখিল, উর্দ্ধে অনন্ত নীল, নীলের পর নীল, অঞ্চল ধারে কল-কল্লোলে গঙ্গা বহিয়া যায়, চরণতলে কলহাস্যময় মহাসমুদ্র অনন্ত সুরে গাইয়া উঠিয়াছে,—তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে; শিরে হিমালয় কাহার ধ্যানে

নিমগন! বাঙ্গলা দেখিল, তাহার আশে পাশে এত রূপ, এত সুর, এত গান,—মন প্রাণ বিচিত্র রসে ভরিয়া উঠিল! ভরা প্রাণে ব্যাকুল হইয়া শুনিল, প্রাণের ভিতর কাহার সাড়া, কাহার আকুল আহ্বান! তখন বাঙ্গালীর কবি গাইয়া উঠিল,—

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ"

বাঙ্গলা তখন প্রাণের ভিতর ডুব দিয়া দেখিল, কত মণি, কত মাণিক্য তাহার সেই আঁধার প্রাণে পরতে পরতে আলোক বিকিরণ করিতেছে। ভাবিল, আমার প্রাণে কে আছে, কি আছে? কে আমাকে বাহির হইতে রূপে, রসে, গানে, গন্ধে জড়াইয়া জড়াইয়া আকুল করে, আবার অন্তরের অন্তরে আসিয়া এমন করিয়া স্পর্শ করে? কাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই? কে বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি এমন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠে; বাঙ্গলা প্রাণে প্রাণে বুঝিল, এ যে বাহিরের ও ভিতরের এক অপূর্ব্ব মিলন। এই মিলন উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল' অনন্ত সাগর দূরে যেখানে দিক্‌চক্রবালের পরিধিপারে মিলিয়াছেন, সেখানে শুধু এক রেখার মত সরল, শান্ত নিবিড়, যেন মিলাইয়াও মিলায় নাই, মিশিয়াও মিশে নাই, প্রভেদ অথচ অভেদ। আবার ফিরিয়া দেখিল ধরণী মহাকাশকে চুম্বন করিতেছে, ঢলিয়া পড়িয়া বলিতেছে, "হে আকাশ, আমাকে লও, আমি যে তোমারই।" আকাশও ধরণীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়াছে, বলিতেছে, "এস এস, আমি ত তোমারই।" দেখিল, সে এক মহামিলন। বুঝিল, জন্মে জন্মে সকলই সার্থক! জন্ম সার্থক! মৃত্যু সার্থক! দেহ সার্থক! প্রাণ সার্থক! আত্মা সার্থক! এই মহামিলন সার্থক! বাহির শুধু বাহির নয়, অন্তর শুধু অন্তর নয়। ইন্দ্রিয় দিয়া

যাহা প্রথম ধরা যায়, তাহা শুধু বহিরাবরণ। প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবেরই একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক। তাহারই নাম বস্তু। জীবন এই মহামিলনমন্দির। কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র রস, কত না সুরের খেলা, কত না রসের মেলা ;—আমরা যে তিলে তিলে নূতন হইয়া উঠিতেছি। বাঙ্গলার কবি তখন চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে গাহিলেন,—

"নব রে নব নিতুই নব,
যখনি হেরি তখনি নব!"

আদিম যুগ হইতে বাঙ্গলার বুকে অনেক আশা, অনেক ভাব আপনা আপনি জমাট বাঁধিতেছিল। সে যে হৃদয়ের মাঝে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে, কাহার খোঁজ করিতেছিল, মিলন-পরশের জন্য আকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মনের ভিতর ডুবিয়া ডুবিয়া যেই দেখিতে পাইল, আর সে আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তখন কবি গাইয়া উঠিলেন,—

"হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইনু সে"

হৃদয়ের মাঝে যে ভাব আপনা আপনি ফুটিতেছিল, সে যেন মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। "সে রূপ-কেমন? যেন,—

"চরণ-কমলে ভ্রমরা দোলয়ে
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক"

তাহাকে দেখিয়া কবি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, শুধু অন্তরের ভিতর মরমের সেই লুকান ঘরে বিভোর হইয়া দেখিতেছিলেন। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আনিল, তখন দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সেই মানস-প্রতিমা, জীবন-প্রতিমা,—

"চম্পক-বরণী, হরিণ-নয়নী * * *
চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী
পরাণ সহিত মোর।"

—ইহাই বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাণ। প্রাণের সঙ্গে, মর্ম্মের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে,—ভাবের সঙ্গে, কর্ম্মের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে,—জীবনের সঙ্গে, বাহিরের ও ভিতরের এমনই প্রাণস্পর্শী মিলন। বাঙ্গালী জানুক, আর নাই জানুক, বুঝুক আর নাই বুঝুক, আমার বাঙ্গলার প্রাণ সে মহামিলনে ভোর হইয়া আছে। সেই মহামিলন-মন্দিরে পূজা যে নিয়ত চলিতেছে; বাঙ্গলার গান, তাহার আরত্রিক—বাঙ্গলার ভাষা তাহার মন্ত্র। সেই বাঙ্গলার কবি চণ্ডিদাস। সেই কবিতা বাঙ্গালীর কবিতা।

বাঙ্গলা দেশে সাহিত্যের অঙ্গনে এই গীতিকাব্য লইয়া আজকাল একপ্রকার মল্লযুদ্ধ বাধিয়াছে। নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক, দলাদলি, দ্বেষ, ঈর্ষা জাগিয়াছে। আজ দেখিতেছি, যে প্রাণের অনুভূতি লইয়া চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিরা গান গাইয়াছিলেন, সে ধারা, সে প্রাণের মতন, মনের মতন, সে "বিষামৃতে একত্র করিয়া" প্রাণ-রন্ধ্রে সে বংশী আর যেন ফুকারিয়া উঠে না। কাব্য লইয়া, কবিতা লইয়া, সাহিত্য লইয়া, রস-সৃষ্টি লইয়া, নানা বিশ্লেষণ, কঠোর অনুশাসন, ধর্ম্ম ও নীতির দোহাই, আদর্শের বড়াই, স্বজাতীয়তা ও বিজাতীয়তা, নিকৃতির ওজনে তৌল করিয়া, কষ্টি-পাথরে খাদ কত পড়ে, এই যাচাই, বাছাই, ঝাড়াই, করিতেই দিন গত হয়, কিন্তু

"দিন গত নহে শ্যাম, তব চরণে এ দিন গত"

সে সুরের, সে সৃষ্টির, সে জাগরণের, সে মিলনের কথা নাই, সে কথা বুঝিবার ইচ্ছাও নাই। সে বাঁশীর ধ্বনি আর শুনিতে পাই না—

"সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কে দূর করব পিয়াসা"

আমাদের ঠিক সেই অবস্থা।

আজ এই সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সেই তর্ক, মীমাংসা, যুক্তি, এই ভাবদ্বৈতের কারণ বুঝাইতে হইলে, আমি যে খুব ভাল করিয়া তাহার ঠিক মীমাংসা, ভাষ্য ও টীকাটীপ্পনির সহিত দেখাইতে পারিব, এমন হয় ত নাও হইতে পারে; তবে বাঙ্গলা কবিতার প্রাণ ও বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর্শ যে কি, তাহা বোধ হয়, বলিবার সময় আসিয়াছে। তাই আজ এই সমবেত সাহিত্যের দরবারে আমি সেই সকল কথাই বলিতে চাই, কোন্ পথে যাইলে হৃদয়-উৎসের দেখা মিলিবে, তাহারই খোঁজ করিব। আপনারাও যদি আমার সঙ্গে একবার এই বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের ভিতর দিয়া সেই অবিরাম কবি চিন্তামণির 'মণি-কোটা'র সন্ধানে আসেন;—ধৈর্য্য ধরুন, সে বাঁশীর রাগিণী আপনাদেরও কান জুড়াইবে, প্রাণ জুড়াইবে। ধৈর্য্য ধরিলে মুরারি মিলিবে। সে নূতনের সাক্ষাৎ মিলিবেই মিলিবে। সে যে "নিতুই নব"। নিজে নূতন হইতেছে, সাথে সাথে এই জাগ্রত বিশ্বও নব নব উন্মেষে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে।

এখন কথা হইতেছে কাব্য কি? গীতি-কবিতা কি? সাহিত্য কি? সাহিত্যের আদর্শই বা কি? ফুল যেমন তাহার ভরা রূপের ডালি লইয়া একদিনে ফুটিয়া উঠে না, তেমনি আদর্শও এক দিনে, এক মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আসে না। অনন্ত কালের যে অনাহত সঙ্গীতের আহ্বান চলিয়াছে, সেই আহ্বানের টানে ফুল আপনার সেই বিরাগ ও অনুরাগ লইয়া কত যুগ-যুগান্তরের স্মৃতির অক্ষুণ্ণ ধারার ভিতর দিয়া গৌরবে সৌরভে আপনার আত্মবিকাশ করে। বিকাশই যে জীবনের ধর্ম্ম;—রূপে রূপে বিকাশ, শতেক যুগের ফুল শত জন্ম ধরিয়া

ফুটিয়া উঠিতেছে। ভাব-সাগরের প্রতি ঢেউ উঠিয়া, দুলিয়া আপনার ইচ্ছায় খেলিয়া, আবার সাগরে মিলাইয়া যায়। জীবনের ধর্ম্ম ও বিকাশের ধর্ম্মই তাই। অনন্তকাল হইতে তাহা আছে, অনন্তকালই থাকিবে, তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

"মাটীর জনম না ছিল যখন
তখন করেছি চাষ।
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস।"

সিতাসিত কাল পক্ষ, দিবস, রজনী, সবই ছিল, সবই আছে, সবই তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

প্রথম কথা, গীতি-কবিতার জন্ম কোথায়, কবিতা কি? সাধারণতঃ সোজা কথায় হয় ত বলিতে পারা যায় যে, ছন্দোবন্ধ সুর-তালে বাঁধা কথাই কবিতা। সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্ তাহার এক সামাজিকতত্ত্ব বাহির করিতে চান, মনস্তত্ত্ববিদ্ তাহার মানসিক বিশ্লেষণ করিতে পারেন। কিন্তু কল্প-কলার স্রষ্টা যে কবি, সে তাহার হৃদয়মাঝারে যে স্বচ্ছ-দর্পণ-খানি আছে, সেইখানে নয়ন ডুবাইয়া দেখে, সে উৎস কোথায়! প্রথম যুগে আদিম মানব যখন বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বাস করিত, গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া, তৃণ দিয়া ছাইয়া, পাতা দিয়া ঘিরিয়া; কুটীর রচনা করিয়া, আপনাদের থাকিবার মত আশ্রয় করিয়া লইত; তখন হইতেই তাহাদের ভিতরে একটা সামাজিক ভাব পরস্পর পরস্পরের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিত। তখন তাহাদের শিক্ষা, অনুশীলন, হাব-ভাব, আচার-ব্যবহারের ধারা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্বভাবের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিত। সেই স্বভাব জাত সংস্কার, জ্ঞানে পরিণত হইবার পথে, স্বাভাবিক সুখ, দুঃখ, ভাব,

অভাব যেমন জাগিত, তেমনি মিলিয়া মিশিয়া পূরণ করিতে চেষ্টা করিত। পূর্ণিমা রজনীতে যখন জ্যোৎস্নার অনাবিল ধারায় ধরিত্রীকে স্নাত দেখিত, বিহগ-বিহগীর মধুর স্বরলহরী শুনিত, নির্ঝরের জলধারায় আলোড়িত উপলখণ্ডের ভাষা শুনিত, তাহারা দল বাঁধিয়া নৃত্য করিত, গান করিত আনন্দ উদ্বেলিত হৃদয়ে অধীর হইয়া উন্মত্তবৎ কত ভাবের ও সুরের প্রকাশ করিত। পাখীর সমবেত কলরবোত্থিত গানের মত তাহাদেরও ভাষা ফুটিত, সেই প্রথম গান, সেই প্রথম প্রাণের আবেগ, সেই মানবের প্রথম রসানুভূতি, তাহাই সমাজ-বিজ্ঞানবিদের বিশদ কথা।

দিন গেল, স্বভাব অভ্যাসে দাঁড়াইল, পরস্পর পরস্পরের অনুভূতির দ্বারা নানারূপে ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। দশজনে মিলিয়া যে নৃত্য-গীত চলিত, তাহা ক্রমে অন্য আকার লইয়া অন্য আবেগের ধারায় নূতন রকমের সৃষ্টি হইতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষে সহজাত সংস্কারবশে যুগল মিলিতে লাগিল। তখন সেই দুইয়ের ভিতরে আদান প্রদান, ভাব অভাব, মিলন ও বিরহের পাওয়া ও না পাওয়ার রস উপজয় হইল। গানের ধারাও নূতন হইল, এমনি করিয়া কবিতার জন্ম। তুমি আমি, আমি তুমি, হাসি কান্নার বিলাস!

মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন যে, সেই সময়ে যত রকমের মানুষের মনে, যত রকমের সহজাত সংস্কারের খেলা হইতে লাগিল, তত রকমেই তাহার ভাব ও আকার পরস্পর আপেক্ষিক পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনই এক এক পৃথক্ ভাবের প্রকাশ, প্রত্যেক সেই প্রকাশের সঙ্গে সুরের ও ভাষার স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। যেখানে যেমন ভাবটি ভিতরে ছিল, তেমনটিই বাহিরের আকার লইয়া প্রকাশ পায়। না-পাওয়ার জন্য যে ক্রন্দন, সেই ক্রন্দনে এক অপূর্ব্ব সুর উঠে, সেই সুর গানে পরিণত

হয়। জীবন ও মৃত্যু, শোক ও আনন্দই সেই সংস্কার-যুগের বিশেষ লক্ষণ।

তার পর, দিন গেল, নানারূপে তাহা পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে লাগিল। শীত কাটিয়া গেলে যেমন বসন্ত আসে, আদিম যুগের সে জড়তা কাটিয়া গেলে, তেমনি জীবনের সরসতা আসিল। বিচিত্র রসানুভূতিতে মানব উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন কাঁদিত, দেহের স্বাভাবিক অভাবে; ক্রমে তাহার ভিতরে মনের ভাবাভাব জাগিল, রূপতৃষা আসিল, ভালবাসিতে শিখিল, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতে লাগিল।

কিন্তু কল্পকলার যে স্রষ্টা,—যে কবি,—সে তাহার অনুভূতির ভিতর দিয়া বলিবে, এ যে লীলা! আনন্দঘন-রসাধার মায়াধীশ এমনি করিয়া রসভোগ-লীলা যুগে যুগে করেন। পাখীর বুকের ভিতরেও তিনি গান, সমীর-হিল্লোলেও তিনিই তান, জলের বুকে যে আলোকের নৃত্য, সেও যে সেই নিত্য সত্য রংরাজের রংএর খেলা! তাঁহার ত আদি অন্ত নাই। কেবল ফুটাইয়া ফুটাইয়া রূপে রূপে বিলাস করিয়া, ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া জীবনের চিদানন্দঘন-রস পান করিতেছেন; 'বিশ্বপ্রকৃতিও সেই রস পান করিতেছে। সৃষ্টির আদি অন্ত কে খুঁজিয়া দিবে! আগে পরে কে বলিবে? ছোট বড় বিচার করিবে কে!

এই সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য। প্রত্যেক পা ফেলা ও প্রত্যেক পা ফেলার দাগটি। মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন, এই রূপতৃষাস্বভাব, সৃষ্টি-রক্ষার জন্য মিলিবার পন্থা। কল্পকলার স্রষ্টা বলে, এ তৃষা নয়, এ স্ফূর্ত্তি, রূপের ভিতর দিয়া রূপকে পাইবার, আপনাকে ফুটাইবার, খেলা করিবার, লীলার মাধুর্য্য। মাটি ফাটিয়া তৃণ তাহার শ্যামসুন্দর কোমলতা বিছাইয়া দেয়, ফুল ফোটে, পাখী গায়, আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলায় রঙের পর রং ঝলকিয়া যায়, এ সবই আপনিই হয়; সে 'আপনি' সেই

লীলামৃত রসাধার এ সবই তাঁরই প্রেমের বিচিত্র রূপ-রস! গভীর পঙ্ক হইতে পঙ্কজিনী শতদল বিকশিত করিয়া মৃদুল বাতাসে দুলে, সেও তাঁহারই লীলা। এ বিশ্বসৃষ্টির তাহারই, এ জীবসৃষ্টির সকল খেলাই তাঁহারই; ইহা মায়া নয়, মিথ্যা নয় কৈতব নয়। ইহা পূর্ণ, রূপে রূপে পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর বিলাস-লীলার বিচিত্র ক্রীড়া। এই অনুভূতির জীবন্ত, জ্বলন্ত প্রকাশই শ্রেষ্ঠ কল্পকলা সেই অনুভূতিই সাহিত্যের রস!

কল্পকলার মূল কথা হইল সত্য। জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য। সে চিরন্তন সত্য কাল-দেশের পরিবর্ত্তনের ভিতরেও তাহার অন্তরঙ্গকে বদল করে না। কল্পকলার অন্তরঙ্গের আদর্শও দেশ-কাল-অতীত। সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধির নীতি ও ধর্ম্মের অতীত। কল্পকলা, সেই দিব্য দৃষ্টির কথা। এই যে সাধারণ মানুষের অনুভূতি, কল্পকলাবিদ্ তাহার ভিতরে দেখেন, সেই অনন্তের রসাভাস, সেই রসাভাসের জাগ্রত ছবিখানি তাহার জীবনের এক অনন্ত মুহূর্ত্তের ঋদ্ধি।

কলাবিদের কাছে ভিতর বাহির একই পদার্থ, পরস্পরকে ধরিয়া আছে। শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ Idealistও নয়, Realistও নয়. সে Naturalist শুধু ভাব লইয়াও সে স্বপ্নের দেশে ফুল ফুটায় না, শুধু দেহের রস-রক্তের সন্ধানেই কাটায় না। অনন্ত যেমন অনন্ত মুহূর্ত্ত ধরিয়া আপনা আপনি নিজেকে স্বাভাবিক পরিণতিতে লইয়া আসে, কলাবিদও তেমনি ভাবে জীবনের ধারার সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া সৃষ্টি করেন। জীবন যে সাধনা, সে ত স্বপ্ন নয়। এই বিশ্ব যে অনুপম বিশ্বনাথের বিরাট শিল্প, এ মহা-কাব্যে সকলেরই যথাযথ স্থান আছে, আলোও আছে, আঁধারও আছে। আদর্শ-জগৎই এই প্রত্যক্ষ জগৎ। বেদান্তের মায়াবাদ ভুল। এ প্রাণ সত্য, এ শ্রবণ সত্য, এ চক্ষু সত্য, এ রূপ সত্য, প্রতি অণুরেণু ধূলিকণা হইতে এই মহাবিশ্ব এক জাগ্রত প্রাণময় সত্য। মায়া বলিয়া কোন

জিনিসই নাই। জগন্মিথ্যা নয়, এই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীই কলাবিদের প্রাণ। প্রকৃতির প্রাণে যেমন অন্ধকারা যামিনীতে ঝড়াকারা নিশীথিনীর বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হয়, কবির প্রাণেও তেমনি হয়। এমন কোন ক্রিয়াই নাই—যাহা কলাবিদের সৃষ্টির ভূমি হইতে দেখিবার বস্তু নহে। ইহাই সত্য হিন্দুর প্রাণের কথা; যিনি ভাবুক, যিনি রসিক, এই রসসাধনা যাঁহার অন্তরঙ্গের ভিতর জাগিয়াছে, তিনি সকল কথা বুঝিবেন, তাই চণ্ডিদাস গাহিয়াছেন—

"বড় বড় জন রসিক কহয়ে
রসিক কেহ ত নয়
তর তম করি বিচার করিলে
কোটীকে গুটীক হয়।"

আমি যে মিলনের কথা বলিয়াছি, যিনি যথার্থ কবি, সত্যদ্রষ্টা, তিনি সেই মিলনের উদ্দেশেই বিভোর হইয়া আছেন।

যেমন বিশ্বপ্রকৃতির সকল সৃষ্টি, কল্পকলা-সৃষ্টিও ঠিক সেইরূপ। কারণ ও অকারণের ভিতর দিয়া স্রষ্টা এই মহারূপের বিলাস করিতেছেন, কারণ ও অকারণের মধ্য দিয়া আমরাও জীবনের সে একই বিলাসলীলা সাধন করিতেছি। এই যে সাম্য, এই যে সমদর্শন, ইহাই ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। এই সাধনার ধারায় মানুষ জীবন্মুক্ত। কলাবিদের জীবন এই ধারায় গঠিত। পাপপুণ্যের বিচার তাঁহার নাই, পাপও সত্য, পুণ্যও সত্য, ত্যাগের বিরাট ভাবও তাঁহার কাছে যেমন সুন্দর, সংসারের স্বার্থপরতার খেলাও তাঁহার কাছে তেমনি মধুর। সবই তাহার কেন্দ্র সব কেন্দ্র হইতেই সকলকে এ সমদর্শনের চক্ষু দিয়া দেখিবার ও অনুভব করিবার সাধন তাঁহার প্রাণে বর্ত্তিয়া আছে। তিনি সেই সাধনা, সেই সমদর্শনের প্রেমরাগিণীতে সকলকে মোহিত করেন, নিজেও

সেই সুধা পান করেন, সেই লীলার সহচর হইয়া রহেন, তাই চণ্ডিদাস গাহিয়াছেন,—

"রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্দা
কহে চণ্ডিদাস পুরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা।"

এই বিশ্বসৃষ্টির রস-মাধুর্য্য উপভোগ জীবনের চরম। নিজে আত্মস্থ হইয়া এই বিশ্ব-আত্মার সহিত একান্ত যোগই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ অনুশাসন। এই মানব প্রাণের অন্তর ভূমির সহিত বিশ্বপ্রাণের যে মিলনভূমির অপরূপ দৃশ্য, এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত যে অতীন্দ্রিয় মহামিলনের রস, তাহাই শ্রেষ্ঠ কল্পকলার রাজ্য, তাহাই সংসার ও পরমার্থের মিলনে সম্পূর্ণ জীবন। এই মহামিলনের প্রধান দূতী প্রেম, বিশ্লেষণে কোন নূতন সম্পদ্ গড়িয়া উঠে না। বিশ্লেষণে প্রাণের সমগ্র অনুভূতি হয় না, এবং বিশ্লেষণ ভাঙ্গিতে পারে, সৃষ্টি করিতে পারে না। বিশ্লেষণ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সমগ্রতা হইতে দূরে রাখে, একাত্মবোধে অসহায় করিয়া তোলে,—একমাত্র প্রেমই এই মিলনের মহামন্ত্র, সেই সর্ব্বস্বধন। সেই প্রেমের দেবতা, পরিপূর্ণ, সবল, সহজ, সরল সোহাগ ও আবেগে সকলকেই বুকের ভিতর টানিয়া লন, তিনি এই সারা বিশ্বের, এ বিশ্ব তাহার! কবিতা যদি এই প্রেমের রাজ্যে না পৌঁছায়, এই প্রাণ চিন্তামণির 'মণি-কোটা'র মণি না মিলাইতে পারে, তবে তাহা প্রাণের কবিতা নয়। গীতিকবিতা সেই প্রাণের সে অতল-স্পর্শ রূপসাগরে ডুবিয়া সেই সাগরের কাহিনী ফুটাইয়া তুলে।

এইবার কবিতার ভাষা ও রীতির কথা। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে, 'ছেঁদো' কথায় ভুল না," তাহার মানে ত সকলেই

বুঝেন! কবিতার ছন্দ, তাল, সুর থাকিলেই যে তাহার মধ্যে সেই চিন্তামণির সাক্ষাৎকার মিলিবে; এমত ত নহেই, বরং অনেক সময়ে সেই মিলনের অন্তরায়। এইজন্যই যেখানে ভাবের দৈন্য, সেখানেই উপমার প্রাচুর্য্য। পরিষ্কার কাচ যেমন মানুষের দৃষ্টির অন্তরায় না হইয়া সাহায্য করে, কথাও ঠিক তেমনি ভাবকে জমাইয়া তুলে। কাচ যদি অপরিষ্কার হয়, চোখে ঝাপ্‌সা ঠেকে। ভাষাও তেমনি কোন সুন্দরভাবই সুন্দর আকার না লইয়া ব্যক্ত হয় নাই। ফুলের দেহ হইতে যেমন তাহার রং ও তাহার আকার, যে যে স্থানে তাহার সেই সুন্দর সুবাস ভরিয়া রাখে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেই ফুলকে নষ্ট না করিলে তাহার সুগন্ধটুকু আলাদা করা যায় না, তেমনি ভাবও ভাষাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভাষাও ভাবকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাবও ভাষাকে ছড়াইয়া উঠে না, ভাষাও ভাবকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহা সুডৌল, ও নিখুঁত, সুন্দর, সহজ। তাহাকে গয়না পরাইতে হয় না। অলঙ্কার সৌন্দর্য্যকে বাড়াইবার জন্য; অলঙ্কার দিয়া সৌন্দর্য্যকে বাড়াইলে তাহাকে খর্ব্ব করা হয়, তাহার রূপের জ্বলন্ত সত্যকে অস্বীকার করা হয়। ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ছন্দ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বটে। কবিতা ও গানে কিছু প্রভেদ আছে। গানে যখন আমরা নিজেদের ব্যক্ত করি, তখন সুরই আমাদের প্রধান সহায়, কথা ভাবানুযায়ী উপলক্ষ মাত্র। পর্ব্বতের গায়ে ঘাত-প্রতিঘাতে ঝরণা যেমন বিচিত্র ধ্বনিতে গিরি-গহন মুখরিত করিয়া আপনার পথ আপনি কাটিয়া অবাধে বহিয়া যায়, গানও তেমনি আপনার পথ আপনি কাটিয়া সুরের ভিতর দিয়া পরম চরমে মিলাইয়া যায়। এ জীবন অণু হইতে অণীয়ান্, মহৎ হইতেও মহীয়ান্; জীবন ও মৃত্যু একই সুরের খেলা। আন্তরিকতা সেই জীবন ও মৃত্যুর

বন্ধনী, আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ—প্রাণের অন্তরতম জ্বলন্ত পাবক-শিখা। মানব-জীবন সেই শিখার জ্বলন্ত জাগ্রত মূর্ত্তি, ভাব ও ভাষা তাহার রঙ ও রঙের মিলন মাধুর্য্য।

তাহার পর আর একটি কথা, তাহাকে বলে রূপান্তর। এই যে স্বাভাবিক মনের বিকাশ, তাহাকে ভাগবত সত্যে তুলিয়া ধরা। সেই রূপান্তরই বস্তু ও ভাবের সমন্বয়। বস্তুর অন্তরে যে রূপ, তাহার উৎসকে খুলিয়া দিয়া তাহাকে সেই রূপচিন্তামণির অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যে টানিয়া তোলাই কল্পকলার শেষ রঙ্গের খেলা। এই যে দেহ মন, এই যে ইন্দ্রিয়, তাহার অন্তরঙ্গ ভাবের সহিত সাক্ষাৎ ও সহজ করিয়া দেওয়ার নামই রূপান্তর। এই রূপান্তর দেখাইতে পারিলেই ভোগের মধ্যে ত্যাগ আপনি ফুটিয়া উঠে। ত্যাগের মধ্যে আনন্দ আপনিই উছলিয়া উঠে। সকল জিনিষকেই এই অন্তরের দিক্ হইতে দেখিলেই এই রূপান্তরে পৌছান সহজ হয়। শিল্পের সাধনা করিতে করিতে, রূপ হইতে রূপে বিলাস করিতে করিতে, জীবনে এমন এক মুহূর্ত্ত আসে, সেই অনন্তমুহূর্ত্তে এই রূপ-রাগভরা শব্দ-স্পর্শগন্ধময়ী পৃথিবীর রূপের মাঝে আসল রূপ ঝলসিয়া উঠে, যাঁহাকে চাই, তাঁহারই সাক্ষাৎকার হয়। সেই শুভ-মুহূর্ত্তের জন্যই সকল কল্পকলাবিদের সাধন। সেই শুভ-মুহূর্ত্তেই সকল সৃষ্টি সুন্দর, মধুর, কল্যাণ ও মঙ্গল হইয়া উঠে।

সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশ্বের আত্মা জাগ্রত 'মুখরিত' বিকশিত, সৌন্দর্য্যলীলায় লীলায়িত। প্রকৃতি ও মানব উভয়ের ভিতরই বিশ্বাত্মার সমান খেলা। সকল জীব, বৃক্ষ, লতা, পাতা, অণু, পরমাণু, সকলই প্রকৃতির মধ্যে। সাধনার পথে সাধক বিশ্বের দর্পণে তাহার নিজের মুখের ছায়া যখন দেখে, তখন তাহার সত্যরূপ প্রকটিত হয়। সে দেখে, তাহার সম্মুখে এক নূতন জগৎ,—সেই জগতের ও তাহার এক নাড়ী,—

তাঁহার এক বিরাট্ হৃদয়। সেই বিরাট্ হৃৎপিণ্ড এই বিরাট্ প্রাণ-সমষ্টিকে বক্ষে করিয়া কালের ভিতর দিয়া অকালে ধাইতেছে। তখন তাহার মন সেই বিরাটের রূপের রসে মজিয়া এক অভিনব রূপান্তর সৃষ্টি করে। সেই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহামিলনের অনাহত সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠে।

বাঙ্গলার গীতি-কবিতায় আমি তাহারি সন্ধান পাইয়াছি। বাঙ্গলা সাহিত্যের গীতি-কবিতার ধারায় প্রথম যে ভাষায় আমরা আজকাল গান ও কবিতা পাই, তাহাকে নাকি সন্ধ্যাভাষা বলে। সুপ্তি ও জাগ-রণের সন্ধি, নূতন ও পুরাতনের সন্ধি, আলো ও দো-আলোর খেলা। এই সন্ধ্যাভাষায় সহজিয়া ধর্ম্মের সকল গানই রচনা, আর তাহাই নাকি বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রাচীন সম্পদ্। তাহাতে যে সমস্ত পদ পাওয়া যায়, তাহার অর্থ ও রহস্য এখনও ভাল করিয়া বুঝা যায় নাই। তবে সহজিয়ার মধ্যে যে স্বাভাবিক জীবনের স্ফূর্ত্তির উপর জীবনকে গাঁথিয়া তুলিয়া আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়, এ কথার ভাব তাহার মধ্যে আছে, তা সে যত সন্ধ্যারই আলো-আঁধারি রউক না কেন। তাহার পর গৌড়ীয় যুগ, সেই গৌড়ীয় যুগে চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিদের পদা-বলি-গান অতুলনীয়। আমার মনে হয়, সে ওই সন্ধ্যা-ভাষার বৌদ্ধ সহজিয়ার পদ হইতে চণ্ডিদাসের রাগাত্মিকা পদের মধ্যে কালের বিপুল প্রভাব আছে; অনেক ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া না যাইলে ভাষার ছাঁদ ও রীতি যাহা চণ্ডিদাসে ফুটিয়াছে, তাহা হইতেই পারে না। তবে এ সমস্ত মতামত লইয়া আলোচনা করিবার মত পাণ্ডিত্য আমার নাই। আমি শুধু ভাবের দরজার দ্বারী, সেই মন্দিরের পূজার কিঙ্কর, আমি তাহার কথা কহিব এবং চণ্ডিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী বাঙ্গলা

কবিতার প্রাণের সহজ সরল ভাবগুলি মিনিস্থতার মালার মত গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণব-কবিতা রসভরা পাকা ফলের মত, তাহার খোসা আছে, শাঁস আছে, রসে অনুপম মিষ্টতা আছে, এমন কবিতা বাঙ্গলা দেশের গৌড়ীয় যুগের চণ্ডিদাস ছাড়া আর কাহার গানে আজও পর্য্যন্ত মিলে না। চণ্ডিদাসের অনুভূতি আর কাহার হয় নাই। একদিকে বাঙ্গলার পর্ণকুটীরের কবি চণ্ডিদাস, অন্যদিকে মিথিলার রাজকবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির শিবসিংহ ছিল, লছিমা ছিল, চণ্ডিদাসের ছিল—

"নান্নুরের মাঠে পত্রের কুটীর
নিরজন স্থান অতি"

আর ছিল রামী! একজন রাজ-অনুগ্রহে সম্মান-সুখভোগের মধ্যে পালিত, আর একজন দুঃখ-দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা-পীড়িত। বিদ্যাপতির লছিমা দূরে আকাশের কোলে উজ্জ্বল তারকার মত, আর চণ্ডিদাসের রামী তাঁহার বুকের ভিতর—প্রাণের ভিতর। দুইজনের অনুভূতি এক হয় নাই। দুইজনেই জীবনের সকল দিকের কথা ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, দুইজনে কিন্তু সমান পারেন নাই। দুইজনেই কবিতার মিলনমন্দিরের দ্বারে পৌছিয়াছেন। একজন মন্দির-দ্বারে আসিয়া থমকিয়া থামিয়া গেলেন, আর একজন সেই মণিকোটার প্রাণ চিন্তামণিকে বুকের ভিতর ধারণ করিলেন, গাইলেন,—

"বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব
প্রেম-চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব।"

"রসেতে গাঁথিয়া" এও সেই সহজিয়ারই কথা। এই রসের সাধনাই

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সাধনা। এই রস যে, সেই রসামৃত মায়াধীশের প্রেমের খেলা, যাহার কাছে—

"মায়া আসি প্রেম মাগে"

কেহ কেহ বলেন, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি সুখের কবি, তাঁহারা বোধ হয়, জীবনের সুখ-দুঃখকে ভাল করিয়া বুঝেন নাই। সুখ যখন রূপান্তর হইয়া ভাগবত সত্যে ফুটিয়া উঠে, তখন তাহা সুখ নয়, দুঃখ এবং দুঃখ যখন ভাগবত সত্যে গিয়া পৌছায়, তখন তাহা দুঃখ নয়, সুখ; তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন—

"…. সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তারি ঠাঞি।"

শ্যাম-বিরহে রাধিকা বিবশা, পিরীতি যে সুখের সাগর তাহে দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ টলমল করে অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে, সুখে দুখ দিল বিধি—এই অবধি যুগল প্রেমের লীলায় যে মিলন-বিরহের রস-মাধুর্য্য, তাহাই ফুটিল, কিন্তু এইটুকু হইল ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, স্ত্রীপুরুষের সহজাত মিলনের রসাভাসের মধ্যে যেটুকু তাই, কিন্তু তাহার পরই বাহির ভিতর এক হইয়া গেল, মানুষের এই সুখ, এই দুঃখের ভিতর হইতে চণ্ডিদাস সেই ভাগবত সত্যকে রূপান্তরে টানিয়া তুলিলেন। ইহা নীতিবিদের নীতি নয়, ইহা শুধু রসপণ্ডিতের রস শাস্ত্রের আলাপ নয়; এ যে জীবনের এক চরম অনুভূতির কথা। এই চরম অনুভূতি বিদ্যাপতির হয় নাই। অনুভূতি শুধু আনন্দের ভিতর দিয়া ত' হয় না—সকল রকম বিচিত্রতা না আসিলে জীবন কে উপলব্ধি করিতে পারে? এই সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়াই সেই প্রাণের সাক্ষাৎকার হয়, আর প্রাণের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়

মন যে রসোচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠে, তাহাই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় দাঁড়ায়। একদিকে জীবনের অনুভূতি, অন্যদিকে রসের ভিতর দিয়া রূপান্তর, চণ্ডীদাসের প্রায় প্রত্যেক কবিতায় তাহার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু বিদ্যাপতির তাহা নয়, তিনি গানে যে রসের মধ্যে যে অবস্থার কথা কহিয়াছেন, তাহাতে শুধু ইন্দ্রিয়ের ভোগ, রূপ-রস-গন্ধের অনুপম সামঞ্জস্য ও মিলন; তিনি সেখানে স্বয়ং সেই রূপ-রসের মধ্যে ডুবিয়া আছেন, কিন্তু চণ্ডীদাস সেই রূপ-রস-গন্ধের মধ্যে ডুবারির মত ডুব দিয়া মণি তুলিয়া উঠাইয়াছেন। বিদ্যাপতি গাইলেন, রাধার বিরহের কথা,—

"আপনহি পেম তরু অর বাঢ়ল
কারণ কিছু নাহি ভেলা।
শাখা পলব কুসুমে বেআপল
সৌরভ দশদিস গেলা।
সখি হে দুরজন দুরনয় পাএ।
মূর জঞো মূড়হি সঞো ভাগল
অপদহি গেল সুখাএ
কুলক ধরম পহিলহি অলি অওল
কঞোণে দেব পালটাএ
চোর জননি নিজঞো মনে মনে ঝখঞো
রোঞো বদন ঝাপাএ॥
অইসন দেহ গেহ ন সোহাবএ
বাহব বম জানি আগি।
বিদ্যাপতি কহ আপনহি আউতি
সিরি সিবসিংহ লাগি॥"

প্রেমের তরুবর আপনি বাড়িল, কারণ কিছু ছিল না, শাখা পল্লব-

কুসুমে ব্যাপ্ত হইল, সৌরভ দশদিকে গেল। হে সখি, দুর্জ্জনের দুর্ণীতি পাইয়া যেন মূল শীর্ষের সহিত ভাঙ্গিয়া গেল, অস্থানে পড়িয়া শুখাইয়া গেল। ফুলের ধরম প্রথমেই অলি আসিল, কে ফিরাইয়া দিবে? চোরের মার মত মনে মনে শোক করিতেছি। এরূপ অবস্থায়, দেহ গৃহ ভাল লাগে না, বাহিরে যেন অগ্নি উদ্‌গিরণ করিতেছে। বিদ্যাপতি কহে, শ্রীশিবসিংহের লাগিয়া আপনি আসিবে। আর চণ্ডিদাসগাইলেন,—

"নিঠুর কালিয়া না গেল বলিয়া
জানিলে যাইত সাথে।
গুরু গরবিত বসতি আমার
পরাণ লইয়া হাতে॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
আপন অন্তর না কর বেকত
তবে সে কহে যে তোরে॥
মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানে মনের মরম
এ রসে মজিল যে॥
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে॥
কে আছে ব্যথিত যাবে পরতীত
এ দুখ কহি যে কারে।
হয় দুখভাগী পাই তার লাগি
তবে সে কহি যে তারে॥

পর কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে!
চণ্ডিদাস বলে বনের ভিতরে
কভু কি রোদন সাজে॥

রসজ্ঞ সুজন মাত্রেই যিনি এই বিচ্ছেদ ও মিলনের রসে রসিক ও দরদী, তিনি উভয়ের এই দুই পদ আলোচনা করিলেই বুঝিবেন, বিদ্যাপতি শুধু মাত্র রসের কথায় মজিয়াছেন, কিন্তু চণ্ডিদাস তাহাতে মজিয়া ডুবিয়া জীবনে এক নূতন অনুভূতির কথা বলিতেছেন। দুইটি গানে একই রকমের ভাবের ও কথার মিল পাওয়া যায়, হয় ত উভয়ে স্বতন্ত্র ভাবেই ইহার স্রষ্টা, অথবা একজন একজনের আগে কিংবা পরে, কিন্তু তাহা লইয়া এখানে আমরা আলোচনা করিতে চাই না। আমি শুধু এখানে ভাবের দিক্ দিয়াই বিচার করিব। বিদ্যাপতির রাধিকা কহিতেছেন, প্রেমের তরুবর আপনি বাড়িল, কিন্তু দুর্জ্জনের দুর্নীতিতে তাহা উপযুক্ত স্থানের অভাবে শুখাইয়া গেল। আর সেই স্থলে চণ্ডিদাসের রাধিকা কহিতেছেন,—

'গুরু গরবিত বসতি আমার'

আমি প্রাণ হাতে করিয়া বাস করিতেছি, সই রে, তোকে আর কি বলিব, এ রসে যে মজিল, সেই মনের মরম কথা জানিবে। বিদ্যাপতির রাধিকা বলিতেছেন, 'কুলের ধর্ম্ম প্রথমেই অলি আসিল, কে ফিরাইয়া দিবে?' চণ্ডিদাসের রাধা বলিতেছে,—

'কুলবতী হইয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে॥
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।'

এই জায়গায় উভয়েই একই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু মনে মনে শোক করিতেছি, মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতেছি”র. ব্যঞ্জনা হইতে ‘পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কাঁদিতে নারে’ এই কথা কয়টীতে ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে, ইহাতে ঐ ভাবটির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাহার পর বিদ্যাপতির রাধার অবস্থা ‘গৃহ ভাল লাগিতেছে না, বাহিরেও অনল ঢালিয়া দিতেছে’ ভিতরে বাহিরে জ্বলিয়া মরিতেছেন, এমন অবস্থায় বিদ্যাপতি কহিলেন, শিবসিংহের লাগিয়া আপনি আসিবে। অর্থাৎ তাঁর শিবসিংহের প্রেমে বদ্ধ, শিবসিংহ তাহাকে আনিয়া দিবেন। চণ্ডিদাসের শিবসিংহ ছিল না, তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে হয় নাই, রাজার মন রাখিতে হইত না। তিনি বলিলেন রাধিকার মুখে—

‘কুলবতী হইয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে,’

শুধু এই খানেই তিনি তাঁহার রাধার অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—

‘পর কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডিদাস বলে, বনের ভিতরে
কভু কি রোদন সাজে॥’

এই সমস্তটাকে একটা সার্ব্বভৌমিক সত্যের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। বিদ্যাপতি শুধু রাধার অন্তরে প্রবেশ করিয়া রাধার কথার সঙ্গে নিজের প্রাণের ভাব মিলাইয়া জড়াইয়া দিলেন, কিন্তু চণ্ডিদাস রাধাকে রাধাই রাখিলেন, তাহার মনের, শুধু রাধার মনের নয়, কুলবতীর মনের কথাটি এমন সহজ সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহার তুলনা হয় না। তারপর নিজে রাধা হইয়া অথচ দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার রাধার

সমস্ত ভাবটিকে বিশ্বের সার্ব্বজনীন সত্যের উপর রাখিয়া তাহাকে গাঁথিয়া দিলেন। ভারত শিল্পের আদর্শে যেমন বিশ্বের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির কথা পাওয়া যায়, ইহাও ঠিক সেই রকম। দেবালয়-প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে ধারা ভারত-শিল্পে পাওয়া যায়, সে দেবমন্দিরে প্রত্যেক পাষাণখণ্ডের সার্থকতা থাকে; বিশ্বকে আদর্শ করিয়া যেখানে যেটি যেমন ভাবে থাকিলে সুন্দর হয়, বিচিত্র হয়, সেখানে সেটি ঠিক তেমনি ভাবে গাঁথিয়া তোলা, এমন কি সেই মন্দিরের স্থানে স্থানে স্তুপীকৃত প্রস্তরখণ্ড ও বালুর রাস জমান থাকে, খণ্ড প্রস্তর যে পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাহার স্বাধীন পরিণতি যে বিশ্বের স্থানে স্থানে হয় নাই, তাহার নিদর্শন। বিশ্বকে আদর্শ করিয়াই ইহার রচনা। কবি চণ্ডিদাসের পদাবলী তেমনি যেন প্রকাণ্ড মন্দির। ভারত-শিল্পে স্থাপত্য যেমন অতুলনীয়, চণ্ডিদাসের পদাবলী তেমনি সার্ব্বজনীন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের পরস্পরের এই সমস্ত পদাবলী পূর্ব্বরাগ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখাইবার স্থান এখানে নাই, কেননা, তাহা অতি বিস্তৃতভাবে, বিশদভাবে, না দেখাইলে তাহার ঠিক চরম্ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তবে উভয়ের পদাবলীর রসবিভাগ করিয়া তাহার অনুভূতির কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বিদ্যাপতির প্রেমে বেদনা অপেক্ষা সুখের আতিশয্যই বেশী। তাহাতে দুঃখটুকু যেন সোহাগ করিয়া ঢালিয়া দেওয়া তাহাতে প্রাণের সে তীব্রতা, আন্তরিকতা নাই। কিন্তু প্রাণের ভিতর যে অতলস্পর্শ সমুদ্র আছে, তাহাতে গাহন করিতে পারেন নাই। সে ত্রিভুবনব্যাপী তন্ময় বিরহ বিদ্যাপতির ভিতর নাই। আছে ছন্দ সুর তাল, অনন্তসাধারণ উপমার ছটা, ভিতরের কথা ভাল করিয়া অনুভূতিতে না আসিলে, উপরের কথাই বেশী হইয়া পড়ে। অলঙ্কারেই সৌন্দর্য্যকে ম্লান করে। বিদ্যাপতির কাব্যে কতকটা তাহাই ঘটিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্তের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গলার এই প্রেম-রসের সাধন রাধা-কৃষ্ণ-লীলার গানে গৌড়জনের প্রাণমন শীতল করিত। দেশে তখন অবাধ হাওয়া, অজস্র জলধারা, শ্যাম প্রান্তর, অজয়ের ফেনমুখ গৈরিক জলস্রোত! পাখিতে রাধাকৃষ্ণ বুলি বলিত, মানুষে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আদর্শে জীবনের অনুভূতি লাভ করিত। বাঙ্গলা দেশ তখন গানে গানে মুখরিত ছিল। সে কাল এখন নাই। সে পদাবলী সাহিত্যের গানগুলিকে বৈষ্ণব কবিরা, এক এক রসে ভাগ করিয়া সমস্ত গাঁথিয়া দিয়াছেন। সমস্ত পদাবলী গানগুলি তাহাতে যেন ফুল-লতা-পাতার রঙ্গের বিচিত্র সমাবেশ। প্রত্যেকটি যেন এক একটি খিলান, আর রস যেন সেই খিলানের চাবি, সেই খিলানের পর খিলান গাঁথিয়া এক বিশাল বিরাট্ মন্দির রচনা করিয়াছেন,—যাহাতে মানবের সকল অবস্থার রসলীলাই তাহার মধ্যে ফুটিয়া আছে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের যে সকল পদাবলী ভাব সম্মিলনে বা রাগাত্মিকায় আছে, তাহারই মধ্য হইতে আমি সেই শ্রেষ্ঠ অনুভূতির ও রূপান্তরের যে যে ভাব, স্তর ও ধারা পাইয়াছি, তাহাই বলিব। বিদ্যাপতির একটি সর্ব্বজনবিদিত পদ আছে, তাহাকে লোকে পদাবলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা বলে,—

"সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম্ রূপ নিহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল॥

কত মধুযামিনী রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল !
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তৈঁও হিয় জুড়ন ন গেল ॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহে ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে ন মিলন এক ॥"

আমার মনের ধারণা যে, লোকে এই কবিতাটিকে অতি শ্রেষ্ঠ বলে, তাহার কারণ তাঁহারা চণ্ডিদাসের পদাবলী আলোচনায় যে রসজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাই বিদ্যাপতির এই পদের উপর আরোপ করিয়া তাহার এত গভীর অর্থ করেন। বিদ্যাপতির শেষ কথা হইল,—

"লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তৈঁও হিয় জুড়ন ন গেল,"

ইহা সেই চির-নূতন ভাবের রসোল্লাসের কথা। জন্ম হইতেই আমি রূপের মধ্যে নয়ন ডুবাইয়া রাখিয়াছি, তবু সে রূপের সীমা পাইলাম না, লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া বঁধুকে বুকে বুকে করিয়া রাখিলাম, তবু এ হৃদয় জুড়াইল না, নয়নের তৃষ্ণা মিটিল না। বিদ্যাপতি এই মিলনের মধ্যে সেই মহামিলনের জন্য ব্যাকুল, তাহার আভাস জাগিয়াছে। বিশ্বের রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধকে তিনি জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, রূপ রস গন্ধও তাঁহাকে তেমনি আগ্রহে জড়াইয়াছিল, তিনি তাহাদের ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই; এদের সঙ্গে জন্ম হইতে দেখা শুনা, তবু তাহাদের পরিচয় ভাল করিয়া হয় নাই, আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে বুকে বুকে করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। তিনি "প্রেয়"র মধ্যেই

ডুবিয়াছিলেন, প্রেয়র মধ্যে শ্রেয়কে দেখিতে পান নাই ; আর চণ্ডিদাস গাইলেন,—

“বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া এক-মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
* * * *
আঁখির নিমিষে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডিদাস কয় পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥”

সেই কথা শুধু আঁখির তৃপ্তির কথা নয়, না দেখিলে পরাণ যে বাঁচে না। বিদ্যাপতি সুর বদলাইয়া উপরের পর্দ্দায় উঠেন নাই, চণ্ডিদাস সুরের আসল রূপটি ধরিয়া একেবারে অন্তরের ভিতর চাহিয়া ডুবিয়া গেলেন, গাইলেন—

“বঁধু তুমি সে পরশ-মণি হে
তুমি সে পরশ-মণি।
* * *
(এক) তিলে শত যুগ দরশন মানি
ছেড়ে কি রহিতে পারি হে॥”

এখানে যে সব মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেছে। এখানে শুধু ইন্দ্রিয়গ্রামের সুর নয়, এ সুর অন্তরের মিলন-মন্দিরের অনাহত-ধ্বনি!

তার পর বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা'—

"যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ
মিলি মিলি পরিজন খায়।
মরনক বেরি হেরি কোই ন পুছত
করম সঙ্গ চলি যায়॥
এ হরি বন্দো তুয় পদ নায়।
তুয় পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হোয়ব কোন উপায়॥"

পাপকর্ম্ম দ্বারা যতেক ধন সঞ্চয় করিলাম, পরিজন মিলে মিলে খায়, মরণের সময় কেহ জিজ্ঞাসাও করে না, কর্ম্ম সঙ্গে চলিয়া যায়—

অন্যত্র—

'আধ জনম হম্ নিদে গমাওল
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রস-রঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসান।
তোহে জনমি পুণ তোহে সমাওত
সাগর-লহরি সমাণ।"

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে মাধব, আমার পরিণামে আর আশা নাই। কিন্তু প্রেমে যে ডুবিয়া, রসিয়া মরিয়া, বাঁচিয়া উঠিয়াছে, তার এ মরণ-ভয় কেন? প্রেম যে অজেয় অমর; সে ত মরণের সময় ভয়

পাইবে না, তার ত পরিণাম ও পরিণতি নাই। সে যে নিত্য সত্য জীবন্মুক্ত, তাহার এ ত্রাস কেন? তিনি বলিতেছেন,—

"আদি অনাদিক নাথ কহাওসি
অব তারণ ভার তাহারা—"

তোমায় আদি অনাদির নাথ লোকে বলে, এখন তরাইবার ভার তোমার; হে মাধব, আমায় তরাও। কিন্তু কি চণ্ডিদাস গাহিলেন,—

"মরমে মরমে জীবনে মরণে
জীয়ন্তে মরিল যারা
নিতুই নূতন পীরিত রতন
যতনে রাখিল তারা"

যারা প্রেমে এমন করিয়া মরিয়াছে, তাহাদের সবই সে নিতুই নব। তাহাদের ত পরিণাম ভয় নাই।

"সুজন পীরিতি পরাণ রেখ
পরিণামে কভু ন হবে টোট।
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার॥"

এ যে সুজনের পীরিতি, এ যে পরাণ মন ভরিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে ত কাম-গন্ধ নাই। এ প্রেমে পরিণামে কভু টুটিবার ভয় নাই। সে যে নূতনকে আরো সৌরভে স্নিগ্ধ করিয়া আনিয়া দেয়। চন্দন যেমন ঘষিতে ঘষিতে দ্বিগুণ সৌরভে আমোদিত করে, এ প্রেম তেমনি।

"পুত্র পরিজন, সংসার আপন
সকল ত্যজিয়া লেখ
পীরিতি করিলে তাহারে পাইবে
মনেতে ভাবিয়া দেখ"

চণ্ডিদাসের পাপের ভার বোধ হয় নাই। যে প্রেমের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া হেম হইয়াছে, তার আবার পাপ কি; তাহার সেই প্রেমের মধ্যে "তাহারে পাইবে" এ বিশ্ব-সংসার তাঁহারি, তাঁহাকে যখন পাইলাম, তখন 'পুত্র পরিজন সংসার আপন' সকলি ত মিলিল. তার পর চণ্ডিদাসের শেষ অনুভূতি। এখানে চণ্ডিদাস জন্ম-মৃত্যুর অতীত, সুখ-দুঃখের অতীত, ভয়-ভাবনার অতীত ইন্দ্রিয়গ্রাম সব ডুবাইয়া এক অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতের রসসিন্ধুর মাঝে ঢেউয়ের মত দুলিতেছেন।

"মা বাপ জনম না ছিল যখন
আমার জনম হ'ল
দাদার জনম না ছিল যখন
পাকিল মাথার চুল
ভগ্নীর জনম না ছিল যখন
ভাগিনা হল বুড়া।
অনিত্য কুলের একি বিপরীতে
ন পিতা ন পিতা খুড়া
শ্বশুর শাশুড়ী না ছিল যখন
তখন হয়েছে বউ
ঘরের ভিতরে বসিয়া রয়েছে
ইহা না বুঝয়ে কেউ
মাটীর জনম ছিল না যখন
তখন করেছি চাষ
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস

(এখন) একুল ওকুল দুকুল ডুবিল
পাথারে পড়িল দেহ
কহে চণ্ডিদাস কে আমি কে তুমি
ইহা না বুঝয়ে কেহ ॥”

ইহা চণ্ডিদাসের শেষ কথা, অনুভূতির চরমোল্লাস। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকমের প্রাণের সম্পর্ক, সকলই ছিল—আছে। অনন্ত অনন্তকাল ধরিয়া আছে, খেলা চলিয়াছে, এখন একুল ও ওকুল দুকুলেরও ভাবনা নাই, লীলা-সাগরে দেহ পড়িয়া ভাসিতেছে। চিরজন্ম চিরকাল কল্পকাল ধরিয়া তুমি আর আমি এই খেলার রসে মজিয়া আছি। এ কেহ বুঝে না, যে রসিক হইয়াছে, যে ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছে, সেই সে জানে ঘরের কথা :

চণ্ডিদাস জীবনে সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই সকল রসের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার অনুভূতিতে সিদ্ধ হইয়া তবে এমন কথা বলিয়াছেন। চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির আর বিশদ সমালোচনা করিবার স্থান এ নয়, সময়ও অল্প, এই কয়টা কথা যাহা বলিলাম, ইহাতেই আমি সে কথা বোধ হয় বুঝাইতে পারিয়াছি। বিত্তাপতির দোষের কথা যাহা বলিলাম, সে শুধু চণ্ডিদাসের সঙ্গে তুলনা করিয়া; কিন্তু বিত্তাপতি যে খুব বড় কবি, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে, চণ্ডিদাসের জীবনে যে অনুভূতি পাওয়া যায় বিত্তাপতিতে তাহা পাওয়া যায় না, সে অনুভূতি আর কোন কবির হয় নাই। তবে এইটুকু মাত্র বুঝা যায় যে, সেই আদর্শেই বাঙ্গলা এখন পৌছিতে চেষ্টা করিতেছে। আশা করা যায়, হয় ত আবার সেই বাঁশীর ধ্বনি কর্ণে আসিবে, প্রাণসুন্দরের সে বিমল রূপমাধুরী আবার আমার দেশে ফুটিয়া উঠিবে।

চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

"মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা,
কায নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা
আমার বাহির দুয়ারে, কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা,
তোরা নিসাড় হইয়া আয় না সজনি
আঁধার পেরিলে আলা।
আলোর ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে সেথা,
ও দেশের কথা এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরম ব্যথা ॥"

যে দেশের কথা চণ্ডিদাস গাহিয়াছেন, সেই দেশের কাহিনী গানে না ফুটাইলে গানের সার্থকতা কই? কল্পকলা ও জীবনের আদর্শ তাহা না হইলে বা মিলে কই? তিনি বলিতেছেন, "বাহির দুয়ারে কপাট লাগিয়াছে, এখন ভিতর দুয়ার খোলা। তোরা নিসাড় হইয়া চুপে চুপে আয়, দেখ্‌বি, আলোর মাঝে সেই কালো।" এ সবই সেই দেশের সেই ঘরের কথা।

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির পর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আবির্ভাব। চণ্ডিদাসের ভালবাসায় যাহা ভাবের ও রসের অনুভূতি আশ্রয় করিয়াছিল, মহাপ্রভুতে তাহা জীবন্ত জাগ্রত জ্বলন্ত হইয়া উঠিল। দিনমণি-সূর্য্যের সঙ্গে যেমন উষার অরুণালোকের সম্পর্ক, চৈতন্যের সঙ্গে চণ্ডিদাসের ঠিক সেই সম্পর্ক; চণ্ডিদাস অরুণের রথ বাঙ্গলায় জানাইয়া

গেলেন, রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীর পূর্ণ :রূপ আসিতেছে—উঠ উঠ জাগ—

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দিব্যোন্মাদের পরে বলিলেন —

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

হে জগদীশ! আমি তোমার নিকট ধন চাহি না, জন চাহি না, মনোহর কবিতা চাই না, এ সকলের কিছুই আমি কামনা করি না, কিন্তু জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তি জন্মে, আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

চণ্ডিদাসের গানে যা অভাব ছিল, মহাপ্রভুর জীবনে তাহার পূরণ হইল। মহাপ্রভু বলিলেন, "অহৈতুকী ভক্তি দাও, জগদীশ, আর কিছুরই কামনা করি না।"

হে প্রাণবল্লভ! আমি তোমারই, আর যে কিছুই জানি না; ইচ্ছা হয় দয়া করিয়া আমায় আলিঙ্গন দাও। অথবা পায়ের তলে দলিত করিয়া সুখী হও, কিংবা অদর্শনে আমার মর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া ফেল। হে লম্পট, তুমি আমার যে বিধান করিলে সুখী হও, তাই কর, তাই আমার ভাল, কারণ আমি জানি তুমি যে আমার প্রাণনাথ—অপর কেউ ত নয়।

যখন রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর তত্ত্ব-বিষয়ে প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল—তাহার কথা বলিব! যদিও তাহাতে গীতি-কবিতার কিছু নাই, তথাপি চণ্ডিদাসের উপলব্ধি জ্ঞানের ও রসের মধ্যে দিয়া কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া মহাপ্রভুতে তাহার শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার কথা বলিতে চাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে তাহার সুন্দর বর্ণনা আছে। রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, রায় কহিতে লাগিলেন,—

"প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহা বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ ভক্তি-সাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেম-ভক্তি সর্ব্বসাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর!
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় কিছু আগে আর॥
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব প্রেমসাধ্য-সার॥"

ইহার পর যখন মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন রামানন্দ কহিলেন,—

'রায় কহে আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার'

তখন রায় রামানন্দ স্বরচিত একটি গান গাহিলেন, বলিলেন,

"প্রভো, শুধু একটী কথা মনে পড়িতেছে, সেই কথাটী বলিলেই আমার বলার শেষ হয়, কিন্তু তাহাতে আপনার চিত্ত-বিনোদন হইবে কি না, তাহাতে যে সন্দেহ হইতেছে।" মহাপ্রভু ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, 'রামরায়, বল বল, সেই রাধা কৃষ্ণের বিলাসবিবর্ত্তের কথা শুনিতে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে।" তখন রায় গাহিলেন। সর্প যেমন ফণা তুলিয়া বাঁশীর স্বর শুনে, মহাপ্রভু তেমনি ভাবে দুলিয়া দুলিয়া শুনিতে লাগিলেন।

'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥'
না সো রমণ, না হম্ রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥'

এখানে শ্রীমতী বলিতেছেন :—

না সো রমণ না হম্ রমণী
দুঁহু মনোভাব পেশল জানি।

মন এখানে প্রেমরসে ভরপূর। ভেদ-বুদ্ধির রসের অতলে ডুবিয়া গেছে! ইহাই কল্পকলার শ্রেষ্ঠ রূপান্তর।

যুগল প্রেমের এই যে বিলাস-বিবর্ত্ত, চণ্ডিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে তাহার অপরূপ স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। সে শুধু ভাব-রাজ্যের অনুভূতিতে নয়, দেহ মন কর্ম্মে ধ্যানে ধারণায়, তাহার সমাধিতে তাহা ভরিয়া উঠিয়াছিল! তাই মনে হয়, চণ্ডিদাস যেন মহাপ্রভুর সৃষ্টিকে আনিতেছিলেন। শতেক যুগের যে ফুল ফুটিবে, তাহাই বাঙ্গলার মনে লুকাইয়াছিল, যে

'হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
এখন দেখিনু সে',

এমন করিয়া ভাব রাজ্যের খেলার সৃষ্টিতে সহজ সরল রূপে সত্যরূপে রূপান্তর হইয়া উঠিল। কবির ভাব জাগ্রত মূর্ত্তি ধরিল, কবি যে স্রষ্টা কবি যে ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলে। চণ্ডিদাস সেই রূপান্তরের স্রষ্টা। বাঙ্গলার গীতি-কবিতার যদি আদর্শ থাকে, প্রাণ থাকে, তবে ইহা বাঙ্গলার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। চণ্ডিদাসের গান আর মহাপ্রভুর জীবন ইহাই বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব।

শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বাঙ্গলা গানে ও প্রেমে মাতিয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডিদাসের গৌড়ীয় যুগে যে সকল রসের লীলায় দেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর তাহার ব্যাপ্তি ও পরিধি আরো বাড়িয়া উয়াঠিছিল, আরো সার্ব্বজনীন হইয়া সেই ভাব গানে, জীবন ও কর্ম্মে মধুর হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাগবতে ভগবান্‌কে শুধু যুগলরস-মূর্ত্তিতে দেখে নাই, তাহার ভিতর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রসাবতারণা আছে। লীলা এই বিশ্বের চরমের মধ্য দিয়া শুধু মধুরেই মিলায় নাই; তাহাতে কল্যাণ ও মঙ্গলের কথাও আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব যুগে তাহার কিছু কিছু সাধনাও হইয়াছিল। এই ভাগবত ধর্ম্মের সঙ্গে রামানুজ ও মাধ্বের ভাব শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেশে আসিয়াছিল। মহাপ্রভু তাহাকে আপনার করিয়া লইয়া নিজেতে তাহার সমন্বয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জন্মের পর, আমরা যে সমস্ত পদাবলী সাহিত্যের গান পাই, তাহাতে সেই পূর্ব্বকার যুগল সম্বন্ধের কথার ভিতর দিয়াই পৌঁছিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই রূপান্তরই তাঁদের আদর্শ ছিল বটে, কিন্তু মহাপ্রভু যে পাপীর উদ্ধারের নূতন কথাটি আনিলেন, কাব্যে তাহার চরম পরিণতি ও রূপান্তর হয় নাই। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিরা সেই পথের পথিক হইয়াই চলিয়াছেন, চণ্ডিদাস হইতে কেহই অগ্রসর

হইতে পারেন নাই, এমন কি, সে আদর্শেও পৌছিতে পারেন নাই। তবে এইটুকু বেশ বুঝা যায় যে, সকলেই সেই আদর্শের জন্ম ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই পদাবলীর ভিতর সেই একই সুর, একই ছন্দ, একই তাল।

কবি জ্ঞানদাসের একটি পদকীর্ত্তন তুলিয়া দেখাইব যে, সেই একই ধারা অক্ষুণ্ণ ভাবে রহিয়াছে,—

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে
কি আর বলিব সই কি আর বলিব
যে পণ করাছি চিতে সেই সে করিব
রূপ দেখি হিষার আরতি নাহি টুটে
বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধারে
লহু লহু কহে কথা পীরিতি মিশালে।
ঘরের সকল লোকে করে কানাকানি
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাব আগুনি।'

সেই একই কথা—

রূপ দেখিয়া হৃদয়ের রূপতৃষা ত মিটে না, সে যে কি সুখ, তা কেমন করিয়া বলিয়া উঠিব, তাহাকে দেখিয়া তাহার স্পর্শের জন্ম গা যেন

কেমন করিয়া উঠিতেছে। এ ত সেই পূর্ব্বরাগ। জ্ঞানদাসের পদের একটু বিশেষত্ব আছে, সে বৈশিষ্ট্য—তাঁহার মুরলী শিক্ষা—

'মুরলী করাও উপদেশ
যে রন্ধ্র যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম
কোন রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম

* * *

জ্ঞানদাস শুনিয়া কহ এ হাসি হাসি
রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী'

জ্ঞানদাস বলিতেছেন, রাধা নামে সাধা বাঁশী রাধার মুখে ও 'রাধা বলিবে, তার উপায় কি? বাঁশীরও সেই ভাব রূপান্তর হইয়া আছে সেও ত রাধা ছাড়া আর কিছু বোল বলিতে পারে না, তারও জীবন যে রাধা। কিন্তু এই সকল কবিতায়ই চণ্ডিদাসের ছাপ। এ কবিতা-গুলির মধ্যে চণ্ডিদাসের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের পর আমরা যে কবির পদাবলী পাই, তাহার ভিতরে সেই আগেকার রাগিণীই ফুকারিয়া উঠিতেছে। তবে বাঙ্গলা দেশের একেবারে ঘরের কোণের কথার ভিতর সেই ভাব সত্যরূপে ফুটিয়াছে, এখানেও কল্পকলার সেই রূপান্তর। কবি লোচনদাস, চৈতন্যমঙ্গল প্রণয়ন করেন। তাঁহারই একটি পদে আমরা দেখিতে পাই, তাহা এই—

"এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস
আমি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি
(আমায়) অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।

মণি নও মাণিক নও হার করে গলায় পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
(আমায়) নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুননিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
(বঁধু) তোমায় যখন পড়ে মনে, (আমি) চাই বৃন্দাবন পানে
এলাইয়ে কেশ নাহি বাঁধি!
রন্ধন-শালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করে কাঁদি॥
কাজর করিয়া যদি নয়নেতে পরি গো
তাহে পরিজন পরিবাদ।
বাজন নূপুর হয়ে চরণে রহিব গো
লোচনদাসের এই সাধ॥"

ইহার ভিতর সেই প্রেম, প্রাণের ভিতর কুরিয়া কুরিয়া বাহির হইয়াছে। গৌরাঙ্গের জন্মের পর বাঙ্গলায় আর এত বড় কবি জন্মায় নাই। লোচনদাস গৌরাঙ্গের ভাবে বিভোর হইয়া গাইয়াছিলেন,—

"আর শুনেছ আলো সই গোরা ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ কাঁদে আকুল তথা॥
হলুদ বাটীতে গৌরী বসিল যতনে।
হলুদ বরণ গোরাচাঁদ পড়ি গেল মনে॥
মনে প্রাণে মৈল ধনী রূপ মন প্রাণ টানে।
ছনছনানি মনে গো সই ছটফটানি প্রাণে॥
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন, কিসের হলুদ বাটা॥
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভেসে গেল পাটা॥

উঠিল গৌরাঙ্গ ভাব সমবরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারখারে॥
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর।
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার॥"

বাঙ্গলার ঘরকন্নার কথার ভিতর দিয়া এমন করিয়া আর কখন কাব্য-রস ফুটে নাই, এ অপূর্ব্ব, অনুপম। গৌরাঙ্গ জীবন্ত প্রেমের ভাবে মাতোয়ারা হইয়া দেশকে প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করিয়া গিয়াছিলেন। ভাগবতে যে মধুর ও মঙ্গলের আভাস আছে, চৈতন্যে তাহার সমন্বয় হইয়াছিল। একদিকে নিত্যানন্দ আর একদিকে যবন হরিদাসের মিলন, আর অন্যদিকে জগাই মাধাই উদ্ধার। এই সকল লইয়া অনেক পদকীর্ত্তন আছে এখনও বাঙ্গলায় তাহা ভিখারী বৈষ্ণবে গাহিয়া বেড়ায়। কিন্তু তাহাতে কল্পকলার সে রূপান্তর কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই—শুধু আভাসেই থামিয়া গিয়াছে। চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস প্রভৃতি কবিরা যেমন রসের অনুভূতির সঙ্গে তাহাকে সেই রূপান্তরে লইয়া গিয়াছেন, ইঁহাদের ভিতর অন্যান্য কবিরা আর তেমনটা পারেন নাই। কেহ বা বলিতেছেন,—

'হরি হরি আর কি এমন দশা হব
ত্যজ্য করি মায়ামোহ ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ
কবে হাম প্রকৃতি হইব॥'

ইহা কবি নরোত্তম দাসের পদে আছে। পুরুষদেহ ত্যাগ করিয়া প্রকৃতি হইবার সাধ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু চণ্ডিদাস প্রভৃতির ভিতর বাহির এক হইয়া গেছে। চণ্ডিদাস যা গাইয়াছেন, কবি লোচনদাসও তাহাই গাইয়াছেন,—

"এ দেশেতে কবাট দিলে, সে দেশ তো পাই
'বাহির গাঁয়ে কাম নাই চল ভিতর গাঁয়ে যাই'
সাপের মণি বাহির করিলে হারাই যদি মণি
মণি হারাইলে তবে না বাঁচয়ে ফণি ॥
যতন করে রতন রাখা বাহির করা নয়
প্রাণের ধনকে বার করিলে চৌকী দিতে হয় ॥
লোচন বলে ভাবিস কেনে, ঢোক আপনার ঘর
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মন ডুবায়ে ধর ॥"

ইহা অবস্থার কথা, ভাষার জ্ঞানের দ্বারা ইহা বুঝান যায় না। চৈতন্যের যুগে পরবর্ত্তী গীতি-কবিদের মধ্যে একমাত্র লোচনদাসই চন্দিদাসের ভাবের ও রসের অনুভূতির পর্দ্দায় গাইয়াছিলেন, তাহার পর আর সমগ্র গৌর-পদ-তরঙ্গিণীর ভিতর এমন কেহ নাই, যাঁহার কবিতায় সে অনুভূতির লেশমাত্র পাওয়া যায়। সুর নামিয়া যাইবার কারণ কি? কারণ যে ঠিক কি, তাহা বুঝা কঠিন। তবে একটা কারণ বোধ হয় এই, যে ফুল শতযুগ ধরিয়া ফুটিতে চাহিতেছিল, যাহার জন্য সেই সন্ধ্যা-ভাষায় আধো আলো আধো আঁধারের ভিতর হইতে ভাব ফোট-ফোট হইয়াও ফুটে নাই, তাহার পর দিন গেছে। মানব মনের ভিতর দিয়া অজ্ঞানে সে ভাবের ধীরে ধীরে স্ফুরণ হইয়াছে, ধীরে ধীরে কত যুগ অন্ধকার ও আলোকের, আশা ও নিরাশার ভিতরে চণ্ডিদাসে দেখা দিয়াছে, বিদ্যাপতির রূপ রসাভাসে ফুটিয়াছে। সেই ফুল যখন চৈতন্যে আসিয়া সাক্ষাৎ ফুটিয়া দশদিশি গন্ধে ভরিয়া গেল, তখনই সেই শত শত যুগের কল্পনা সত্যরূপে প্রতিভাত হইল। তাহার পূর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতর হইয়া প্রকাশ হইল। ইহার পর ভাগবত ধর্ম্মের সহিত রামানুজের যে লীলা ভক্তির ভাব দেশে আসিয়াছিল, সে ভাব এখনও পূর্ণ ভাবে মুঞ্জরিত

হয় নাই। চণ্ডিদাসের প্রেম, বিদ্যাপতির রূপ-বিলাস, লোচনের গৃহধর্ম্মের সরল সহজ প্রাণের কথার সঙ্গে যে দিন সেই সার্ব্বভৌমিক কল্পকলার সূচনা হইবে, সে দিন জগৎ দেখিবে, এই বাঙ্গলার প্রাণ কোথায়, তাহার মর্ম্ম কোথায়! আবার বাঙ্গলার মাটীতে তেমনি আবেগে, তেমনি সোহাগে তেমনি মধুর করুণ উজ্জ্বল লীলায় ফুটিয়া উঠিবে। পূর্ণ হইতে পূর্ণতর রূপ হইতে রূপান্তরে ফুটিয়া জাগিয়া উঠিবে।

এই নরদেহ ধারণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া জগতের অজ্ঞ, বৃদ্ধ, শ্রান্ত, তৃষিত, তাপিতের জন্য যে করুণা, মহাপ্রভুতে তাহার পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। শ্রীনিত্যানন্দে আমরা তাহার জীবন্ত, সজীব, জাগ্রত মূর্ত্তির ভাব পাই। যখন কলসীর কাণায় কপাল কাটিয়া দর-দর ধারে রক্ত ঝরিতেছে, তখন গাইতেছেন,—

"মেরেছ কলসীর কাণা
তা বলে কি প্রেম দেব না॥"

এই দুই ছত্র যখন মনে পড়ে, তখন মন প্রণ এক অদ্ভুত নব-রসে উছলিয়া উঠে, আঁখি ছল ছল করে, মনে হয় আমার জন্ম সার্থক, সার্থক আমি বাঙ্গলায় জন্মিয়াছি!

বৈষ্ণব কবিদের এই অফুরন্ত গানের সুধার ধারায় সারা বাঙ্গলা দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। সমাজে দেশে তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু কালে সকলি ত বদল হয়। সেই সব-জুড়ান প্রাণ-মাতান সুধা-স্রোতে ধীরে ধীরে চড়া পড়িল, সে ধারা শুকাইয়া আসিতে লাগিল। সাহিত্যের অন্যান্য ভাগ শাখা-পল্লবে ভরিয়া গেল, কিন্তু যেমনটি ছিল, তেমনটি আর হইল না। যখন মুসলমান বাঙ্গলায় প্রবেশ করিল, তখন বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি একেবারে হারায় নাই, তখন সমাজে মাঝে মাঝে বিপ্লব বাধিয়াছে; সুর উঠিয়া, সুর নামিয়াছে। তাহার পর সে নিজেকে

হারাইয়া ফেলিল। বাঙ্গলা আপনাকে ভুলিয়া গেল। মুসলমান ধর্ম্ম হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গলা আপনার চারিধারে আচার-ব্যবহারের একটা গণ্ডী টানিয়া দিল—সেই তাহারি মধ্যে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিল। কিন্তু সাহিত্যে ভাবে ও ভাষায় মুসলমানের হাত একেবারে এড়াইতে পারিল না। দেশ তখন নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। একদিকে শাক্তের পঞ্চ-মকার, আর অন্যদিকে বৈষ্ণবের শুখনা মালার ঠক্‌ঠকি, আর চারিদিকে যত শৈবের দল ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতেছিল। একদিকে দেশের পতি মুসলমান, অন্যদিকে সমাজের পতি অসংখ্য ভূত প্রেত। এতদিন ধরিয়া যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বাঙ্গলা নিজেকে আদর্শের সমান করিয়া আনিয়াছিল, সে শক্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল। অন্ধকারের ভিতর দিয়াই বাঙ্গলা চলিয়া আসিল। তাহার পর কত নিশি পোহাইয়াছে, কত পাখী গাইয়াছে, অরুণ কিরণে শ্যামল অঞ্চল উড়িয়াছে, কিন্তু যে মিলনের কথা বলিয়াছি, তাহা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেল। মুসলমান বাঙ্গলায় আসিবার পর বাঙ্গলা শ্রীহীন হইয়াছিল, একে দেশ দুর্ব্বল, তাহার উপর মানসিংহ বাঙ্গলার রাজা। প্রাণের কবিতা তখন দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল।

এমনি করিয়া সুখে দুঃখে আলো অন্ধকারের ভিতর দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ আসিল। রাজার পৃষ্ঠপোষিত সাহিত্য যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছিল।

ভারতচন্দ্রের উপর বৈষ্ণবের প্রভাব থাকিলেও তাঁহার কবিতা মুসলমানী ফার্সীর আরব ছবি ও ছায়ায় পরিপূর্ণ। তাঁহার চরিত্র অঙ্কনে যথেষ্ট নিপুণতা থাকিলেও এ কথা বলিতেই হইবে যে, চণ্ডিদাস-যুগের বৃন্দা ও বড়ায়ের জায়গায় তিনি আনিলেন, মুসলমানী

কেতাবের কুট্‌নী দাসীর কেচ্ছা। সে প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা নাই, সে সখীর মত সখী নাই; সে সখীর জন্ত অন্ধকারে প্রাণের আবেগে তাহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইবার কেহই রহিল না। ভিতরে বাহিরে প্রাণের রস মরিয়া সে ধারা শুখাইয়া গেল।

তাহার পর অকস্মাৎ কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে রামপ্রসাদের জন্ম হইল। দেশ আবার গানের আস্বাদ পাইল। বৈষ্ণব কবিদের ঘরসংসার ঘেরিয়া যে কার্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপরে তিনি নূতন রসের অনুভূতি দেখাইলেন, তিনি গাইলেন,--

"ওরে সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী
নির্ব্বাণে কি আছে ফল জলেতে মিশায় জল
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি।"

এও সেই বৈষ্ণবের অহৈতুকী ভক্তির কামনা। বাঙ্গলা আবার সেই সুর খুঁজিয়া পাইল, সাধকের সাধনা, ভাবের সাধনা ফুটিয়া উঠিল, রামপ্রসাদ গাইলেন,—

"এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।"

এও সেই দেশের কথা, যে দেশের গান চণ্ডিদাস গাইয়াছিলেন। রামপ্রসাদের পর বাঙ্গলা আবার কিছুদিন গানে ভরিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানে বাঙ্গলার পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই যুগকে বাঙ্গলার 'গানের যুগ' বলা যাইতে পারে। বিচিত্র ভাব, বিচিত্র সুর, বিচিত্র পদাবলী, ভাষা ও ভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। যে বাঁশী একদিন বাঙ্গলাকে জাগাইয়াছিল, যাহার সুরে বাঙ্গলার সুখ-দুঃখ জড়াইয়া জড়াইয়া দেশের জীবন মরণের প্রাণ হইয়াছিল, সেই সুরে আবার বাঁশী ডাকিল। তাহাতে বিচিত্র সুরের মেলা। মুসলমানী কেচ্ছার আবিল স্রোতে বাঙ্গলা সাহিত্য ঘোলা হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার জাত

গিয়াছিল, তাহার ধর্ম্ম গিয়াছিল। রামপ্রসাদের গানে আবার তাহা ফিরিয়া আসিল। রামপ্রসাদের মাতৃভাবে, বাঙ্গলা মায়ের রূপে দেখা দিলেন। কখন্ মা আমার বাপের ঘর হইতে শ্বশুরঘরে যাইতেছেন, কখন্ কৈশোর ও যৌবনের মধুর অভিনয় করিতেছেন, কখন কোলের ছেলেকে হারাইয়া মা পাগলিনীর মত কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন,—

"আমার উমা এলো বলে রাণী এলোকেশে ধায়"

বাঙ্গলার সেই আলিপনা দেওয়া ঘর, সেই তুলসীর বন। সেই গৃহস্থের আঙ্গিনা, সেই মৃদুল মধুর বাতাস বহিয়া যায়।

তার পর নিধুরাম বসু, হরু ঠাকুর, রূপচাঁদ পক্ষী প্রভৃতি কবিওয়ালারা আসিলেন। গানে দেশ তোলপাড় হইয়া গেল। সকলেই সেই কল্পকলার রূপান্তরে পৌছিতে যথেষ্ট সাধন করিয়াছেন। কিন্তু সে আদর্শে কেহই পৌছিতে পারেন নাই।

রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন আজু গোঁসাই. তিনি কতকটা রামপ্রসাদের ছাঁদ ধরণ লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মত অবস্থায়, নিজেকে সে রূপান্তরে দাঁড় করাইতে পারেন নাই। তাহার পর নিধু বাবুর গান। তাঁহার এক নূতন কথা, নূতন ভাব, ভাষার দিক্ দিয়া দেশের জীবনকে আত্মস্থ করিবার প্রথম চেষ্টা তাঁহাতেই প্রকাশ দেখিতে পাই। তিনি গাইলেন।

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥"

তখন হইতে বাঙ্গলা জাগিতে শিখিয়াছে। সে গানে যুগের অবতার, সাধক রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পূর্ব্বে কিছু দিন যে থামিয়াছিল,

তাহার পর অবিরাম জলোচ্ছাসের মত গান আসিতে লাগিল। আবার সেইরূপ প্রেম, সেই ভালবাসার গান ফুটিয়া উঠিল। নিধু গাইলেন,—

"তারে দেখ্‌তে এত সাধ কেন।
তিলেক যদি না হেরি সজল নয়ন॥
আভরণ করিয়াছি লোকের গঞ্জন।
তাহার কারণে মরি সে নহে আপন॥
তাহার রূপের কথা অকথ্য কথন।
তবে যে ভুলেছে মন জানি না কি গুণ॥"

আবার—

"তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী সেও কান্দে কলঙ্কচ্ছলে॥
সৌরভে গরবে, কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গা-পূজা গঙ্গা-জলে॥

এই মিঠে ভাষা বাঙ্গলার প্রাণের রাগিণী। শুনা যায়, নিধু শোরির পাঞ্জাবী মুসলমানী টপ্পার অনুকরণ, সেই সকল সুরের ধরণে, এই সব প্রেম ভালবাসার গান বাঁধিয়াছিলেন, এই গানগুলিকেও লোকে নিধুর টপ্পাই বলে। কিন্তু সুরের মুসলমানী ঢঙকে এমন আপনার করিয়া লইতে আর কেহই পারে নাই। আবার দেখুন,—

"না হতে পতন তনু দহন হইল আগে
আমার এ অনুতাপ তারে যেন নাহি লাগে।
চিতে চিতা সাজায়ে তাহে দুঃখ-তৃণ দিয়ে,
আপনি হইব দগ্ধ আপনারি অনুরাগে॥"

ইহাতে প্রাণের গভীরতা আছে, সুরের অতি মিঠা রস আছে,

বাঙ্গলার ইহা নিজস্ব সম্পত্তি। বিদ্যাসুন্দরি ফার্সী বয়েতের পর এমন মিঠা গান আর হয় নাই। তাহার পর রাম্ন নৃসিংহের গান,—

"সখি এ সকল প্রেম, প্রেম নয়
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখের উদয়॥
সুহৃদ ভঞ্জন, লোক-গঞ্জন,
কলঙ্ক-ভাজন হইতে হয়॥
এমন পীরিত করি যাতে তরি দুদিক্
ঐহিক আর পারত্রিক।

* * * *

"মন মধুব্রত হয়ে যেন রত, সেই নামামৃত-সুধা খায়।"

ইহাতেও সেই প্রেমের আভাস, তবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার পর হারু ঠাকুরের গান—

"নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে (ওগো ললিতে)
না দেখি এমন রূপ বারি মাঝেতে॥

* * * *

আজু সখি এ কি রূপ নিরখিলাম হায়
নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়
ঢেউ দিও না কেউ এ জলে বলে কিশোরী
দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী॥

* * * *

বিশেষ বুঝিতে নারি নারী বই ত নই (ওগো প্রাণ-সই)
নিরখি নির্ম্মল জলে অনিমিষে রই॥

* * * *

কুল শীল ভয় লজ্জা তার যায়
না রাখে জীবন আশ
তার জলে বা স্থলে বা
অন্তরীক্ষে কিবা সন্দেহ নাহি মরিবার ॥”

হরু ঠাকুর গাইলেন, তোমরা কেউ জলে ঢেউ দিও না, আমার প্রাণকিশোর অখণ্ড চাঁদ যে তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যাইবে। নির্ম্মল জলে, নির্ম্মল হৃদয়ে অনিমিষে তাকাইয়া থাকি। * * যার এমন প্রেম, কুলের ভয় নাই, লাজের ভয় নাই, তার মরিবার ভয়ও নাই।

তাহার পর রাম বসুর গান। কবি ঈশ্বরগুপ্ত বলিয়াছেন, “যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বসুর গীত।” রাম বসুর গানে বাঙ্গলার ঘরের প্রাণের কথা যেমন ফুটিয়াছে, এমন আজ পর্য্যন্ত আর হয় নাই।

“দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না
তোমায় ভালবাসি তাই চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই
কিছু কাল থাক, থাক বোলে ধরে রাখ্‌বো না।
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ আমার গেল।
তোমার পরের প্রতি নির্ভর, আমিত ভাবিনে পর
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না ॥”

এ সকল গানের তুলনা হয় না। তাহার পর—

"মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হ'ল না
সরমে মরম কথা কহা গেল না—
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে—
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে—
সখি ধিক্ থাক্ আমারে ধিক্ সে বিধাতারে
নারী জনম যেন আর করে না॥"

রাম বসুর গানের অনুকরণে আজ কত গানই না বাঁধা হইল, কিন্তু তেমনটি আর হয় না। তেমন করিয়া প্রাণের মধ্যে ডুব দিয়া সরমে মরম কথা বলিবার ধরণ আর নাই। আমার মনে হয়, রাম বসুর পর বাঙ্গলায় আর এমন গান-বাঁধিয়ে জন্মায় নাই—

চণ্ডিদাস হইতে কৃষ্ণকমল পর্য্যন্ত সেই একই ধারা-স্রোতের মত বহিয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণকমল গাইলেন,—

সখিরা বলিল,—

"রাই ধীরে ধীরে চল গজগামিনি
অমন করে যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে গো ধনি,
* * *
না জানি কোন্ গহন বনে প্রাণ হারাবি গো
কত কণ্টক আছে গো বনে—
—(দেখে চল গো কমলিনী)"

দিব্যোন্মাদে কৃষ্ণকমলের রাধিকা বলিলেন,—

আমার আবার কণ্টকাদির ভয় কি ?

"যখন নব অনুরাগে হৃদয় লাগিল দাগে
বিচারিলাম আগে, পাছে কাজে
(যা যা করতে হবে গো আমরা সখি বঁধুর লাগি)
'জানি' প্রেম করে রাখালের সনে, ফিরতে হবে বনে বনে
ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে (সখি আমার
—যেতে যে হবে গো, রাই বলে বাজিলে বাঁশী)
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল
চলাচল তাহাতে করিতাম ; (সখি আমার চল্‌তে
—যে হবে গো, বঁধুর লাগি পিছল পথে)
হইল আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি
গতাগতি করিয়ে শিখিতাম (সদায় আমায়
—ফিরতে যে হবে গো,—কত কণ্টক কানন মাঝে)
এনে বিষ-বৈদ্যগণে বসিয়ে নির্জ্জন স্থানে,
তন্ত্রমন্ত্র শিখেছিলাম কত ;
(যতন করে গো—ভুজঙ্গ-দমন লাগি)
বঁধুর লাগি করলাম যত, এক মুখে কহিব কত
হত বিধি সব কৈল হত ! (হায় ! সে সব
—বৃথা যে হলো গো—সখি আমার করম-দোষে)"

এমন সরল গতিতে সরল কথায় জীবনের খেলায় কেমন অনুভূতির প্রকাশ পাইয়াছে। এমন ভাষা এমন করিয়া প্রাণ মন ভরিয়া তোলা গান আর এখন শুনিতে পাই না।

কৃষ্ণকমল বৈষ্ণব গীতি পুনরুত্থান-কালের শ্রেষ্ঠ কবি।

এখানে চণ্ডিদাসের রাধিকা, বিদ্যাপতির রাধিকা, আর কৃষ্ণকমলের রাধিকা এই তিনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, যদি এই

তিনের সাধ্যভাব এক সঙ্গে সমন্বয় করিতে কেহ পারেন, সে মূর্ত্তি জগতে আজিও সৃষ্টি হয় নাই, কল্প-কলার সে রূপান্তরের জন্য বাঙ্গলা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যাপতির রূপ-বিলাস, চণ্ডিদাসের প্রাণের গভীরতা, আর কৃষ্ণকমলের "স্বাদিতে নিজ মাধুরীতে" যে বিরহ, এই তিনের অপূর্ব্ব রস-রচনা, কোন দেশের সাহিত্যেই আজও পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গলার মাটীতেই সেই তিন ফুটিয়াছে, আবার বাঙ্গলার মাটীতে কি একে—সেই তিন ফুটিবে না। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর যে রাধা-ভাব, সেই জীবন্ত রাধা-ভাবের ছাপ কৃষ্ণকমলের রাই উন্মাদিনীর রাধিকায় ফুটিয়াছে। ভাগবতের উক্তি চৈতন্যের প্রেমাশ্রুতে ধৌত করিয়া কৃষ্ণকমল রাধিকা গড়িয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অমৃত-রস ছাঁকিয়া কৃষ্ণকমল রাই উন্মাদিনীকে বসাইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের রাধায় যে আত্মবিস্মৃতি, সেই আত্মবিস্মৃতিতে রাধার বিরহ জাগিয়াছে। শ্রীচৈতন্যেও তাই! রাধিকা হইয়া বাহ্যপ্রকৃতির রূপে রূপে কৃষ্ণ দেখিতেছেন। পূর্ব্বে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা যেন রাধা আত্মবিস্মৃত হইয়া বঁধু পাইবার জন্য তাহার সে তপস্যার কথা কহিতেছেন। কৃষ্ণকমলের রাধিকা এক অভিনব সৃষ্টি।

বাঙ্গলার মধ্যযুগে 'গানের যুগে' এই বিচিত্র ভাব-সম্পদের কথা আমি এই-খানেই শেষ করিলাম। তারপর অন্ধঘন মসীময় আকাশ,—আর নাই। বাঙ্গলায় প্রতীচ্যের নব আগমনে, তাহার আলোকে, তাহার বুকের সলিতা শুখাইয়া গেল, বাঙ্গলার দীপ নিভিয়া আসিল। বাঙ্গলা চিরদিন পূর্ব্বদিকেই সূর্য্য উঠিতে দেখিয়াছে, অকস্মাৎ পশ্চিম আকাশে বিজলী-ঝলকের মত আলোক দেখিয়া তাহার নয়নে ধাঁধাঁ লাগিল, বাঙ্গলা একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহার প্রাণের ভিতরে যে প্রাণ ছিল, সে তখন তাহার প্রাণপুট বন্ধ করিয়া দিল।

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইলে যেমন সে আলোক সহ্য করা যায় না, বাঙ্গলার প্রাণেও ঠিক সেইরূপ ইউরোপ হইতে যে আলোক সহসা বর্ষিত হইল, তাহা সহ্য হইল না। সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। তার পর ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন, সুরেন্দ্র মজুমদার, বিহারীলাল, নীলকণ্ঠ, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য অনেকেই গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই যুগের এই কবিতার কথা অন্য সময়ে বলিবার চেষ্টা করিব। এখন শুধু একটি কথা বলিয়া রাখিব। আমি যে "রূপান্তরের" কথা বলিয়াছি, আজও পর্য্যন্ত আমাদের এই যুগের গীতিকাব্য সেই রূপান্তরের অবস্থায় পৌঁছিতে পারে নাই। ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় কোনখানেই তাহা মিলে না। মাইকেলের অশেষ ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা' সেই পর্দ্দার কাছেও পৌঁছিতে পারে নাই, ব্রজ কবিতার শুধু নিতান্ত বাহিরের জিনিষ লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়াছিলেন মাত্র। সুরেন্দ্র মজুমদারের "মহিলা", বিহারীলালের "বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গল" আমাদের আদরের সামগ্রী সন্দেহ নাই—কিন্তু ইঁহাদের কবিতাতেও সেই সুর সেই ভাবে জাগে নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য প্রতীচ্য এই উভয়কে মিলাইয়া মিশাইয়া কাব্য সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে কি না, সে বিচার করিবার সময় আমার বোধ হয় এখনও আসে নাই।

একমাত্র গিরিশচন্দ্র সেই গানের ধারা ও ভাবের আভাসকে কবিওয়ালদের পদানুসরণ করিয়া কতক পরিমাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। আর শুধু একজন নীলকণ্ঠ—যাঁর

"সজল জলদাঙ্গ ত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুতলে
হেরিলে হরে জ্ঞান মন প্রাণ পড়ে পদতলে।"

সেই পুরাণ সুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। আজও বাঙ্গলা

ভিখারী বৈষ্ণব তাহা গাহিয়া বেড়ায়। কিন্তু কল্পকলার সেই রূপান্তরে কেহ পৌছিতে পারেন নাই। সকলেরি লক্ষ্য তাই, সাধ্য তাই, সাধনা তাই। সে সাধক এখনও আসেন নাই।

তবে বাঙ্গলা জাগিতেছে। দিনের নাগাল পাইবই পাইব। আবার সেই বাঙ্গালা কবিতা শুনিব। সে সাধক আসিবেই আসিবে। আমি যে তাহার আগমনীর সুর শুনিতে পাইতেছি।

[বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বাঁকীপুর অধিবেশনে
সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।]

"বাঙ্গলার গীতিকবিতা"

(দ্বিতীয় কল্প)

আমার বাঙ্গলার এক চিরন্তন আদর্শ আছে। বাঙ্গলার যেমন শ্যামলশ্রী রূপ, যেমন সবুজ তৃণের কোমলতা, নীল আকাশ আর গঙ্গার উচ্ছল বারি, আমার বাঙ্গলার আদর্শও তেমনি সেই শ্যামলশ্রী, সেই—

"নব রে নব, নিতুই নব,
যখনি হেরি তখনি নব"

হেরিয়া চোখ জুড়াইয়া যায়। বাঙ্গলার গানের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাণের যে অবিচ্ছিন্ন অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্পর্ক আছে, সেই মিনিসূতার মালার গাঁথনির কথা আপনাদের শুনাইব বলিয়া, আজ আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছি।

বাঙ্গলার এক অখণ্ড সত্য আছে, সেই সত্য, যুগে যুগে যখনি যাহার মরমের নিভৃত আলোকে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে তখনি এই মাটীর প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নিবিড় পরিচয় পাইয়া আত্মার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাতেই নিশ্চিন্ত হয় নাই, প্রাণে প্রাণে সেই মিলনবাণী 'লোক-হিতায়' 'জগতে ধর্ম্মস্থাপকায়' দেশে দেশে বিলাইয়া দিয়াছে। সেই পরিচয়েই ধর্ম্মের স্থাপন, সেই পরিচয় হইতেই মানুষের সমাজ, শ্রদ্ধা, সংস্কার। সেই মিলনেই এই অনন্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের রসমূর্ত্তি বুকের ভিতর আঁকিয়া লইয়া জাতি আপনাকে বিকাশ করিতে থাকে। বাঙ্গলার একদিন ছিল, যে দিন বাঙ্গালী আপনাকে সেই পরিচয়ের জোরে জগতের কাছে বাঙ্গালী বলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ

তাহার বুকের ভিতর হইতে সেই সচ্চিদানন্দ চিন্ময় মূর্ত্তি কোন অবসাদের তমোগূঢ় অন্ধকারে মুছিয়া গিয়াছে। সেই যে বাঙ্গলা তাহার নিজের মাটীর পরিচয় ভুলিয়া গেল, সেই হইতেই এই দিনগুলা আঁধারেই কাটিতেছে ; কিন্তু দীপের ধর্ম্মই জ্বলিয়া উঠা। আত্মার অন্তরের পরতে পরতে যে দীপ জ্বলিয়া আলোক বিকিরণ করে, সে আলোকের ধর্ম্মই অন্ধকারকে জ্বালাইয়া দীপ্ত করা। হাজার হাজার বছরের অন্ধকার এই দীপের আলোয় মরিয়া যায়। সকল মানবই সেই পরিচয় লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সকলকেই একদিন সেই সাযুজ্য-পরিচয়ের জন্য আত্মার আত্মার সঙ্গে মুখোমুখি হইতেই হইবে। সেই মধুর পরিচয়টি করাইবার জন্য মাটী অহরহ সজাগ রহিয়াছে। তাহার আর সে চেষ্টার বিরাম নাই, বিরতি নাই, বিশ্রাম নাই, সঙ্কোচ নাই। স্নেহময়ী জননীর মত সে তাহার জন্যই ব্যস্ত। তাই মাটি আমাদের শুধু শরীর দান করে না, আমাদের মন-প্রাণের নূতন জন্ম দিয়া নবজীবন দান করে। শুধু মাটী নহে। মাটীই আমার সঙ্গে অনন্ত রসমুর্ত্তিরূপে আমার প্রাণের সঙ্গে রসলীলাভঙ্গে একদিন সেই প্রাণমণি দীপখানি জ্বালাইয়া দেয়। সেই দীপ একদিন বাঙ্গলার কবিচিন্তামণির বুকের ভিতর জ্বলিয়াছিল, সেই দীপ একদিন মহাপ্রভুর বক্ষের মণিকোটায় জ্বলিয়াছিল, সেই দীপের আলোক মুসলমানযুগের আবহাওয়ার ভিতরেও রামপ্রসাদের প্রাণের ভিতর জ্বলিয়াছিল, সেই দীপ এই ফেরঙ্গ-যুগেও গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীতলে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গলার সাধনার ধারা এমনি করিয়া ধীরে ধীরে রূপরসশব্দস্পর্শগন্ধের ভিতর দিয়া এমনি করিয়া চলিয়া আসিতেছে এই সাধনার ধারাতেই বাঙ্গলার গানের জন্ম। আজ আপনাদের আমি সেই বাঙ্গলার জীবনের ধারায় যে সাধনার গান, সমস্ত দেশকে ও দেশের প্রাণকে সজাগ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই কথা কহিব।

আমার বাঙ্গলার বড় মধুর রূপ। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিধি এত রূপ কই আর ত' কাহাকেও দেন নাই। আমার বাঙ্গলার রূপের কি তুলনা আছে! শ্যামচেলাঞ্চলময়ী বনরাজি-বিভূষিতা সরিৎবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী ভাগীরথী, মার বুকে অবিরাম নৃত্য করিতেছে, চরণতলে উদ্দাম উচ্ছল মহোর্ম্মি-বিস্ফূর্জ্জিত সাগরের দিগন্ত-মুখরিত হলহলা, শিরে নগাধিরাজ ধূর্জ্জটী, সূর্য্যকিরণে ধক্-ধক্ জ্বলিতেছে। মা আমার এক হাতে ধান্যশীর্ষ অপর হস্তে বরাভয়, কোলে বীণা, পদতলে সহস্রদল শ্বেতপদ্ম; আকাশ উজ্জ্বল, তরুণরবি হিরণ-চূর্ণ দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। আশে পাশে ললিতকণ্ঠে পিককুল কলঝঙ্কারে মুখরিত করিতেছে! এ রূপের কি তুলনা আছে! সেই বাঙ্গলা মায়ের বাঙ্গালী ছেলে চণ্ডিদাস, রামপ্রসাদ, মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ, সে বাঙ্গালী যে আজিও মরে নাই, তাই সেই আশার আলোয়, সেই আনন্দে, আজ চোখে জল আসে। কি কাঞ্চন-মণি ফেলিয়া, কি কাচ আজ কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়াছি; রাশি রাশি খড়ির চাপ ও ধূলায় সকল কলঙ্ক শুভ্র করিতেছি; প্রাণের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কি ভয়াবহ পরধর্ম্মের খোলস্ পরিয়াছি। বাঙ্গলা ভুলিয়া বাঙ্গলার ভাব ভুলিয়া, রূপ ভুলিয়া, প্রাণ ভুলিয়া, ধর্ম্ম ভুলিয়া সে মায়ের রূপকে দেখিতে পাই না, দেখিলেও আর চিনিতে পারি না। চোখে পর্দ্দা পড়িয়া গেছে, চোখ খারাপ হইয়া গেছে। আজি চোখের সম্মুখে ইউরোপীয় অবভাসের যবনিকা—চোখ আর সে রূপ চিনিতে পারে না। ইউরোপীয় ভাবের ধারায় ছাঁচে, নিজেদের না ঢালিয়া, আমরা যেন আজ কিছুই ভাবিতে পারি না। কল্পনা ফেরঙ্গ, ভাব ফেরঙ্গ, সমাজ ও সাহিত্যের অঙ্গে, জীবন ও ধর্ম্মের অঙ্গে আজ এই ইউরোপীয় ব্যভিচারী ভাব, আমাদের জীবন ধর্ম্ম সাহিত্য শিল্প ও সব কল্পকলাকে মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে। আজ এই দুর্দ্দিনে সূচীভেদ্য তমসাচ্ছন্ন আকাশতলে এই

ফেরঙ্গ বাঙ্গলার ফেরঙ্গ সাহিত্যের মাঝে অকস্মাৎ বিজলী-ঝলকের মত কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত মায়ের শ্রীরূপ দেখিলাম; সেই পদ্মালয়া, সেই সরস্বতী, সেই অন্নপূর্ণা, সেই সিংহবাহিনী, সেই ভীমা ভয়ঙ্করী রুধিরার্দ্রবসনা করালী—আর দেখিলাম সেই মদনমোহন,—

'বিহি সে রসিয়া তাহাতে পশিয়া
গড়ল দোঁহার দেহা।'

সে যুগলরূপের কি ওর আছে! আধশ্যাম, আধরাধা যেন মেঘ-অঙ্গে বিজলী মিলাইতে চায়; মেঘ যেন বিজলীর ঝলক দিয়া হাসিয়া উঠে, প্রতি মুহূর্ত্তেই নব নব রূপ ফুটিয়া উঠিতে চায়, সকল রূপ প্রতিনিমিষেই সেই যুগলরূপে মিলাইয়া যায়।

'মিলল দুঁহু তনু কিবা অপরূপ
চকোর পাওল চাঁদ পাতিয়া পিরীতি-ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ॥'

আর বাঙ্গালীর কবি চণ্ডিদাস সেই রূপের পাশে রহিয়া, ভাবে গদ্‌গদ হইয়া,

"চামর ঢুলায়ত।"

এই ছবি বাঙ্গলার নিজস্ব। যে মরম জানে, সে রসিক এই রসের কথাও জানে। সেই প্রাণের ধারার সঙ্গে সাধনাঙ্গের ধারার পরিচয় রামপ্রসাদেরও ছিল। রামপ্রসাদ তাই গাইয়াছিলেন,—

"গিরিবর আর পারি না হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে,—
অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
আমি পারি নে হে প্রবোধ দিতে উমারে।"

এ সব গান বাঙ্গলার প্রাণের পঞ্জর হইতে বাহির হইয়াছে, জীবনের সঙ্গে এ রসের অঙ্গাঙ্গী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

আজ বাঙ্গলা সেই প্রাণের প্রাণকে তাহার সাহিত্যের—তাহার জীবনের সেই রূপ, যে রূপের চরণে,—

"মদন মূরছা পায়,"

সেই রূপ ভুলিয়া মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে বাঁচাইতে হইবে। নিজেদের বাঁচার মত বাঁচিতে হইবে। শুধু একটা কাব্যের ধাঁচা দেখাইয়া, রসবোধের রসিক হইয়াছি বলিলে, প্রাণ বুঝে না। আত্মায় আত্মায় রমণে সে রস উপভোগ হয় না। মনুষ্যজীবনের যে চরম পরিচয়, তাহার পথে শুধু অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা আসিয়া ব্যবধান করিয়া দাঁড়ায়। তাই এই মিথ্যাময় ফেরঙ্গ-সাহিত্য হইতে বাঙ্গলার জীবনকে মুক্ত করিতে হইবে। আজ তাহারি বার্ত্তা আমি বহন করিয়া আনিয়াছি। আমি প্রাণে প্রাণে যে অনুভূতি দ্বারা—সাধনের দ্বারা জীবনের সে রূপের যে পরিচয় পাইয়াছি, আমি বাঙ্গালী বাঙ্গলাকে তাহা শুনাইবার জন্য আমি সমস্ত প্রাণ-মন দিয়া প্রস্তুত হইয়াছি। আজ এই তমসাচ্ছন্ন পুঞ্জীভূত অন্ধকারের তামসিকতার দিনে সকল রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া আমাদের জীবনের ধারাকে বাঁচাইতে হইবে। এই ভাবের অপচারের দিনে, ফেরঙ্গ-সাহিত্য ও জীবনের দিনে সমগ্র শক্তিকে একবার অন্তর্ম্মুখী করিয়া বাঙ্গলার সেই প্রাণের প্রাণকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। হে বাঙ্গালা, বাঙ্গলার সেই প্রাণের গানের সন্ধান কর! দেবতা চায় অমৃত, অসুরে চায় অনৃত। মানুষের এই দেহ-মন-প্রাণ প্রতিষ্ঠাত্রয়ের ভিতর অহোরাত্র যে যুদ্ধ চলিয়াছে, সে যুদ্ধে জয়ী হইবার, মহতো ভীতি হইতে নিজেদের বাঁচিবার জন্য বাঙ্গলার সবুজ আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া দিনের আলোকে

নিজেদের সন্ধান করিতে হইবে, তবে সেই অমৃতে আমাদেরই অধিকার। বাঙ্গলার সশক্তিক কবি চণ্ডিদাস রামপ্রসাদের, বাঙ্গলার স্বধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত, শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর অমৃতোপম রসানুভূতিতে যেই রসসৃষ্টি হইয়াছে, প্রাণের জিনিষকে তাঁহারা যেমন বুকের ভিতরে প্রাণ ভরিয়া রাখিতে পারিয়াছেন, সেই সাধনের পথে সেই অনুপম কাব্যসৃষ্টির পথে নিজেদেরও দেশের গতিকে লইয়া যাও নিজের জীবনে ও কর্ম্মে মিলাও, তোমার নিজেরও পরিচয় পাইবে, দেশেরও পরিচয় পাইবে। ফেরঙ্গ-জীবন ও সাহিত্যের এই মহতো ভীতি হইতে তবেই রক্ষা পাইবে। স্বধর্ম্মের—বাঙ্গলার প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম্মের এই পরিচয় পাইলে ;

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ,'

নচেৎ সারা বিশ্ব উজাড় করিয়া বিশ্বের কাব্যভার মাথায় করিয়া আনিয়া, নিজের ও জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া, তাহার স্বাভাবিক সহজ প্রকৃতিগত চিন্তাশক্তি রোধ করিয়া, সত্যের অপলাপ করিয়া, মনকে চোখ ঠারিয়া যাহা কিছু রচনা করনা কেন বেলাভূমে বালুর প্রাসাদের মত এক বন্যায় ধুইয়া মুছিয়া যাইবে, তাহার রেখাও থাকিবে না, কোন চিহ্নও পাইবে না। তাই আজ দিন থাকিতে থাকিতে ফিরিতে বলিতেছি। এ ব্যাধির যে ঔষধ তাহা ওষধি-লতার মত বাঙ্গলারই বনে জন্মিতেছে।

আজিকার দিনে এই জীবন ও সাহিত্য-সৃষ্টির যে ধারা চলিয়াছে, এই ব্যর্থকাম বৈদেশিক খোলসপরা জীবন কল্পরাজ্যে যে শ্রীরামপুরী খৃশ্চান পাদরীর নৈতিক সভ্যতা ও পাপবোধের অপচার মিলাইয়া, আজ শত-বৎসর ধরিয়া জীবন ও সাহিত্যের নামের, জীবনের বিচিত্রতার নামে, ধর্ম্মের নামে যে পুঞ্জীভূত ধূলা, পুঞ্জীভূত অধর্ম্ম, ক্রীতদাসের পরানুকরণ,

—জীবনে ও সাহিত্যের, কর্ম্মের ও ধর্ম্মের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে ছাপ পড়িয়াছে; গানে, সুরে, চিত্তে, স্থাপত্যে যে ক্লেদ, যে পঙ্ক, যে ধূলী, যে খড়ি-মাটীর রং পড়িয়াছে, তাহাকে মুছিতে হইবে; ধর্ম্মে, কর্ম্মে, মনুষ্যত্বে ভাবের দাসত্ব, ভাষার দাসত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। হে বাঙ্গালী, জানিও, তাহা ছাড়া আর কোন পথ নাই,—নাই। তাই সেই জীবন ও ধর্ম্মের, প্রাণ ও সাহিত্যের মাঝে বাঙ্গলার সেই চিরন্তন বাণীকে তোমাদের কাছে, সাহিত্যের মধুর বিচিত্ররূপের ভিতর দিয়া আনিয়া দিতেছি; গ্রহণ কর!—গ্রহণ কর! ইহাকে বৈষ্ণব-তত্ত্ব বা রসের কথা বলিয়া, তত্ত্বের কথা না জানিয়া, রসের কথা না বুঝিয়া ফেলিয়া দিও না। ইহা বাঙ্গলার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, ইহা বাঙ্গলার মাটীর ও প্রাণের মিলন-ভূমি; এই কাব্যলোকেই বাঙ্গলার মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ! মনে করিও না, তোমরা আজ যাহাকে বিচিত্র হওয়া বলিতেছ—তাহা সত্যসত্যই বাঙ্গলার স্বাভাবিক বিচিত্রতা। ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনের কথা মুখস্থ করিয়া, সেই কথাগুলিই রসান দিয়া, বাঙ্গলায় বলিলেই বাঙ্গালীর জীবন হঠাৎ বিচিত্র হইয়া উঠে না। এই মিথ্যা বৈচিত্র্য পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংঘাত জনিত শতখণ্ডের বিচ্ছিন্নতা ও বিভিন্নতা মাত্র। আমি যে প্রাণ ও সাধনার দিকে ফিরিতে বলিতেছি, আমি যে বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে বলিতেছি, বাঙ্গলা তাহার নিজের মাধুরী আস্বাদন করিয়া, নিজে যে বিচিত্ররূপে জগতের কাছে নিজকে ধরিয়াছিল ও আপনি যে শত শত অপূর্ণ ভাবে বিচিত্র হইয়া বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সেই বিচিত্র প্রাণ-ধারারই কথা। পাশ্চত্যের এই ভাব-মোহ এই "বিশ্ব" মোহ যাহা আমাদের সমস্ত স্নায়ুকে, নাড়ীচক্রকে ব্যাধিপীড়িত মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত করিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের উদ্ধার হইতেই হইবে। বাঙ্গলার

নিজের প্রাণকে জানাই তাহার একমাত্র উপায়। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন যে, সাহিত্য ও জীবনকে আমি চণ্ডিদাসের যুগে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাই, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। তাহা নয়; নদীস্রোত উল্টা ফিরিয়া যায় না, সে আপনার পথ আপনি কাটিয়া লয়। সৃষ্টির বীজ অন্তরেই নিহিত থাকে, আঁখির আগে আগেই রূপে ধরা দেয়, পিছনে নয়। বর্ত্তমান জীবনের ধারাকে স্বাভাবিক করিতে হইবে—চণ্ডিদাসের গানের মত স্বাভাবিক। রামপ্রসাদের গানের মত আমাদের সেই স্বাভাবিকতায় ফিরাইয়া লওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। বাঙ্গালার স্বাভাবিকতা ফরাসী রুশের Naturilism নহে। এ স্বাভাবিকতায় প্রকৃতি ও আত্মা আত্মস্থ, প্রকৃতির দাস নহে। তাই সেই যুগের প্রাণময় প্রাণের সুরে ঢালাই করা গানের ধারা ও উৎসের খোঁজ করিতে চাই। আশা করা যায় যে, বাঙ্গালার সেই কাব্যসাধনার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার, তাহার জীবনকে সত্য করিবার পথ আবার আমরা সাধন করিব এবং সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবই করিব ও তাহার সেই উৎসের মূল রসের পথ ধরিয়া সেই নিখিল রসের সকল আনন্দের মাঝে আমাদের বাঙ্গালী-জাতির জীবনের সার্থকতা অনুভব করিব।

কেহ কেহ বলেন, বহুশতাব্দী ধরিয়া আমাদের দেশ পরমুখাপেক্ষা ও পরাধীন। এই পরাধীনতায় তাহার অনেক মানুষী বৃত্তিও অনুশীলন অভাবে নষ্ট হইয়া গেছে। স্বাধীনতার যে আনন্দ, জাতীয়তার যে সংবিৎ, যে স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি তাহাই নাকি কল্পকলার প্রাণ। এই স্বাধীনতাই তাহার বিরাট্ উপায় ও ফল। ইহা আশ্চর্য্য নয় যে, বাঙ্গলা তাহার স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতা হইতে বিচ্যুত হইয়া তাহার জীবনের সরল গতি হারাইয়া, সত্য সুন্দর শিবের ধ্যান ভুলিয়া গেছে। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই বাঙ্গলায় সাংখ্যকার কপিলের জন্ম,

এই বাঙ্গলাই শ্রীচৈতন্যকে দিয়াছে, এই বাঙ্গলাই আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়াছে। এই বাঙ্গলাই একদিন সমস্ত প্রাচ্যকে ভাবে, জ্ঞানে ধর্ম্মে-কর্ম্মে অজেয় নেতার মত চালাইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গলার স্বাধীনতা—তাহার আত্মার আত্মস্থ-সংবিতের অনন্ত প্রেমের প্রতিষ্ঠায়। এই অনন্ত প্রেমের প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মার জীবন্ত রসানুভূতির জন্য বাঙ্গলা যে তপস্যা করিয়াছিল, সেই তপস্যাই কত বিচিত্র রূপে বাঙ্গলার প্রাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলার সাধনা, বাঙ্গলার স্বাধীনতার আদর্শ সেইখানে বাঙ্গলার কলাকলার ভিত্তিও সেইখানেই। সেইখানেই আমাদের গীতিকবিতার ও গানের প্রাণ।

মনুষ্যজীবনের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা কখন সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় হয় নাই— হইবেও না। শুধু পরের দাসত্বের বোঝা ও শিকল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেই তাহাতে জীবনের স্বাধীনতা-রক্ষা হয় না। মানুষের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকল প্রবৃত্তির সকল রসের অনুভূতির, সকল যাতনার উপরে, সকল ভোগের উপরে নিজেকে—নিজের আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে স্বাধীনতা অর্থহীন দেহভোগীর প্রাণহীন বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানুষের মনুষ্যত্ব তাহার আত্মার সংবিতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যে যুগে চণ্ডিদাস ও রামপ্রসাদ চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ জন্মিয়াছিলেন সে যুগও-বাঙ্গলার স্বাধীনতার যুগ নয়, কিন্তু দারিদ্র্যের—পরাধীনতার—সমাজের সঙ্কীর্ণতায় সমস্ত সঙ্কোচ ও ব্যবধানের মধ্যেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রাণের স্বাধীন ইচ্ছাকে দারিদ্র্য, পরাধীনতা সমাজের পেষণ কিছুতেই পাড়িতে পারে নাই। এই সব মহাপুরুষদের প্রাণ-বেদীমূলে মাটী যে সমিদ্‌ভার আহরণ করিয়া দিয়াছিল, তাঁহারা একনিষ্ঠ সাধকের ধারায় নিজেদের মাটীর সম্পর্কে এক করিয়া সে প্রেমাগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলেন। কোন সমাজ সংহিতা, কোনরূপ

দণ্ড তাঁহাদের এই জ্বলন্ত জীবন্ত অগ্নিশিখা নিভাইতে পারে নাই। আত্মার সেই প্রেমরসের অনন্ত বিভূতি, এই পরাধীনতার ভিতর হইতেই তাঁহারা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রেমের সৌরাজ্যে তাঁহারা চিরনূতন সম্রাট্; কেমন করিয়া অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতের জীবন্ত প্রেমভরা মণিকোঠায় পৌঁছিয়া, সেই রসচিন্তামণি আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সেই সাযুজ্য-পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাই আমাদের জানিবার—উপলব্ধি করিবার বিষয়।

কেহ কেহ বলেন, বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য "রূপক"। মানুষের নিজের অর্থাৎ বৈষ্ণবকবিগণের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও সত্যের উপরে নাকি তাহার প্রতিষ্ঠা নহে। রূপ-অরূপের প্রভেদ, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ, বস্তু ও অবস্তুর প্রভেদ শুধু বিচারদ্বারা কতদূর বুঝা যায়, বলিতে পারি না। শুধু বিচার বুদ্ধির উপরে আমার সেরূপ আস্থা নাই। খুব সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির সাহায্যে কল্পিত সত্য মিথ্যা সৃষ্টি করিয়া, সেই সত্য-মিথ্যার সাগরসঙ্গমে দাঁড়াইলে গঙ্গাও দেখিতে পাওয়া যায় না, সাগরও দেখিতে পাওয়া যায় না। মায়া বলিয়া এই জাগ্রত বিশ্বের বিচিত্রতার মধ্যে মায়াধীশকে খাড়া করিয়া, সকল বিশ্বকে বুদ্ধির প্রাখর্য্যের দ্বারা ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিশ্ব উড়িয়া যায় না, মায়াও আপনার প্রকৃতরূপে দেখা দেয় না। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, তাহাকে কল্পনা করিয়া লইয়া ও ইউরোপীয় সাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে সেই কল্পনার সাহায্যে আপনার অভিজ্ঞতা মনে করিয়া লইয়া, সেই অভিজ্ঞতা দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণবকবিতা বুঝিতে গেলে বোধ হয়, রূপকের আবশ্যক হয়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদিগের সে সাধনা প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর সাধনা। বৈষ্ণবকবিদিগের প্রত্যেক অনুভূতি যে তাঁহাদের হৃদয় ও প্রাণের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার উপরেই স্বাধিষ্ঠিত।

বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে প্রাণের সাড়া পাই ; সেই প্রাণকে যে জানে না, জানিবার চেষ্টাও করে না, সে কেমন করিয়া বুঝিবে ? বৈষ্ণবকবিদের শ্রীকৃষ্ণ কাল্পনিক নহে। বৈষ্ণবের রাধা, তাঁহাদের জীবনের প্রাণের মর্ম্মে শতদলের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই যুগলরূপই বাঙ্গলার সভ্যতা, সাধনা, শিক্ষা, দীক্ষার মধ্যে শত শত বিচিত্ররূপে প্রকাশিত করিয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গলার প্রাণ, যাঁহারা বাঙ্গলার প্রাণকেন্দ্র হইতে ইউরোপীয় বিশ্বসাহিত্যের ঝড়ে শতধা দীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন, তাঁহারাই এই বিশাল বিশ্বলীলার জীবন্ত মূর্ত্তি-স্রোতের মাঝে বৈষ্ণব কবিতাকে প্রাণহীন রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। কৃষ্ণ যদি বাস্তবিকই কৃষ্ণ পাওয়াইয়া দেন, তবে ত এ জীবনকে ধন্য মনে করি। কৃষ্ণ বাস্তবিকই বৈষ্ণব পদাবলীর মহাজনদিগকে কৃষ্ণ পাওয়াইয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের কবিতা এত সরল, এত সুন্দর, এত রূপ-বৈচিত্র্যে ভরা-ভরা। এই সব কবিতা বুঝিতে হইলে ইউরোপীয় সাহিত্যের মোহ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে হইবে। বাঙ্গলার যে প্রাণ, তাহার খোঁজ করিতে হইবে, মুখস্থ করা জ্ঞানের যে অহঙ্কার, তাহাকে দূর করিয়া দিতে হইবে।

বাঙ্গলাদেশকে নূতন করিয়া বৈষ্ণব হইতে হইবে না। বাঙ্গলা যে প্রাণে বৈষ্ণব। বাঙ্গলার স্বাভাবিক শক্তি, তাহারই তপস্যা করিতে হইবে। তোমাদের ইহাই বলিতে চাই, শ্রীকৃষ্ণ রূপক নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে, ভারতসভ্যতার ইতিহাসে, হিন্দুর জাতীয় গরিমার ইতিহাসে, তাঁহারা স্থান অতি-অতি-উর্দ্ধে, সেই আদর্শ মহাপুরুষকে শ্রীভগবান্ বলিয়া ভারত-আপামরসাধারণ মানিয়া আসিতেছে, তাঁহার লীলার মধ্য দিয়া ভারত সমাজ, ধর্ম্ম, সভ্যতা অঙ্গাঙ্গিযোগে যুক্ত— তাঁহারই লীলার মহাভাবে পুষ্ট ভারতের কাছে ইহা রূপক নয়, বাঙ্গলার কাছে ইহা রূপক নয়, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। শুধু ঐতিহাসিক নয়,

যুগে যুগে মহাপ্রাণের ভিতর সেই লীলা-আভাস-চঞ্চল মূর্ত্তিতে বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষ মুখরিত ও বিকসিত। যাহা জাতির প্রাণের ভিতর দিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার ব্যবহার, ইহলোক-পরলোককে ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া লইয়া আসিতেছে, তাহাকে রূপক বলিয়া, রকম করিয়া, পাশ্চাত্যের রূপক লইয়া, এত মাতামাতি করিলে চলিবে কেন? চটুলতায় কোন অধ্যাত্মসাধন হয় না। যাহারা দেশের দশ-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, দেশের অন্তরঙ্গ-সাধনা হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, যাহাদের প্রতি কথায়, প্রতি ভাবে, প্রতি কার্য্যে পশ্চিমী সেপাইয়ের খাড়া নজীর দেখাইতে হয়, যাহারা সংসারে জন্ম লইয়া নিজেদের প্রাণকে প্রতিনিয়তই নিজেরা ছলনা করে, যে আলোক তপস্যার দ্বারা প্রাণের পরতে পরতে ঝলসিয়া উঠে, অ আত্মার সে স্বানুভূতি যাহাদের নাই, যাহাদের জীবনটা নিজেদের কাছেই রূপক, তাহাদিগকে বলিবার আমার আর কিছুই নাই; শুধু এইটুকুমাত্র যে, আপনার আত্মার পথ ধরিয়া বাঙ্গলার নবজীবন-উষার প্রাক্কালে, নবোদিত সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেশের সাধনার ধারার মধ্য দিয়া নিজের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া, আপনার কল্যাণের পানে মুখ তুলিয়া, মন মুখ এক কর; তবে বাঙ্গলার আত্মস্থ সাধনার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে। চণ্ডিদাস, রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালাদের মধ্যে, তাঁহাদের নিজেদের জীবনের সুখ, দুঃখ, প্রেম, ভালবাসা, মিলন, বিরহ, সমাজের সহিত বিরোধ, প্রাণ-ধর্ম্মের সঙ্গে প্রচলিত আচার, অনাচার, তান্ত্রিক-আচারের সঙ্গে বিরোধ ও মিলন, স্বাভাবিক হইবার সহজ হইবার যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহারি কথা—এই বাঙ্গলা কবিতার ভিতর হইতে আমি দেখাইতে চাই। যে সকল কল্পকলার ধারায় এই বাঙ্গলা শ্রেষ্ঠ, এই চণ্ডিদাসের ও রামপ্রসাদের গান বাঙ্গলার সেই

কল্পকলার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করিয়াছে। আজ এই ইউরোপীয় অবভাসের দিনে আমি জোর গলায় বলিতে পারি যে, বাঙ্গলার ঘরে সে দীপ আবার জ্বালয়াছে। জানিও ইহাই বাঙ্গলার অভয়-বাণী। এই বাণীকে সত্য ও সার্থক করিতে হইবে।

আর একটা কথাও মাঝে মাঝে শুনিতে পাই যে, বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের গন্ধ বড় বেশী। আধুনিক কবিতার আর এখন instinct এর (স্ব-স্বভাবের) পর্য্যায়ে নাই; তাহা এখন উর্দ্ধগ, অতীন্দ্রিয়ের সুবাসে মত্ত। ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন ভাব কোন সত্তা, আজিও মানুষের ভিতরে অনুভব হয়, এমন বিশ্বাস আমার নাই। ইন্দ্রিয় যাঁহার সৃষ্টি, অতীন্দ্রিয়ও তাঁহারই সৃষ্টি। ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করিয়া অতীন্দ্রিয়ের উপর জীবনের কোন ভিত গাঁথা যায় কি? কেহ আজিও পারিয়াছেন কি? রক্ত-মাংসকে, মাটীকে অস্বীকার করিয়া মানুষের সাধ সোহাগ অস্বীকার করিয়া, কাব্যলোকে কোন শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। তবে আধুনিক নকল ইংরাজী-নবীশদের বুদ্ধির বয়ন-ক্ষায় পড়িয়া, বহুকাল হ-য-ব-র-ল হইয়াছে। তাই এখন শুনিতে হইতেছে যে, বৈষ্ণব কবিতা erotic। বাঙ্গলার সাধনা চিরকালই ইন্দ্রিয়কে সত্যবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া, ইন্দ্রিয়ের সকল রস আহরণ করিয়া ইন্দ্রিয়ের মুখে বল্গা দিয়া চালাইয়াছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার সকল বৈচিত্র্যের পূর্ণ স্ফুর্ত্তি দিয়া তাহাদের সকল বিভিন্নতাকে সে এক করিয়াছে। বহুর মধ্যে, বহু বিচিত্র রসের মধ্যে বাঙ্গলা সমরসের আস্বাদন করিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সত্য খেলাকে বাঙ্গলা কখনও অস্বীকার করে নাই। বৈষ্ণব জানে যে, তাহার মনে, প্রাণে, দেহে এক অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত লীলা করিতেছে, সে যন্ত্র, যন্ত্রী তাহার প্রাণের প্রাণারাম হইয়া আনন্দ-রস লীলাচ্ছলে ভোগ করিতেছেন। এই

ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই শুদ্ধি, ভোগ ও ভুক্তি প্রতিষ্ঠিত। এ ইন্দ্রিয় ভাগবত-ভোগের ইন্দ্রিয়। বাঙ্গলার কবি সাধক, সেই ভোগে আত্মস্থ শুদ্ধির মধ্যে ভুক্তিকে সে প্রাণেপ্রাণে অনুভব করে, মর্ম্মে মর্ম্মে আত্মায় আত্মায় রমণ করে,—এ ভোগ ভাগবত-ভোগ। বাঙ্গলার গীতিকবিতার মর্ম্মে মর্ম্মে এই ভোগের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃশ্চান পাদরীর কাছে বাঙ্গলার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের কথা ও পাপরোধের কথা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমরা আমাদের আদর্শ ভুলিয়া, প্রতীচ্যের রঙিন খোলসে পড়িয়া, নিজের আত্মাকে অস্বীকার করিয়া সাহিত্য ও ধর্ম্মে আত্মহত্যার গৌরব অর্জ্জন করিব?

আজিকালিকার দিনেও এ সব অলীক খৃশ্চানী নীতিকথার ন্যাকামীতে যাহারা ইন্দ্রিয়ের ভোগকে অশুদ্ধ করিয়া তুলিতে চায়, তাহারা বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। বাঙ্গলার বুকের উপর দিয়া অনেক ঝড় বহিয়া গেছে; ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অত্যাচার—সমাজরক্ষার নামে হিংসার অত্যাচার—মানুষের উপর মানুষ যত প্রকার অত্যাচার করিতে পারে, সব হইয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার রূপ, কত রঙের বিচিত্রতায় বদল হইয়া গিয়াছে। কত কবি জন্মিয়াছে, কত অকবি জন্মিয়াছে; গত কয় শতাব্দীর উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝা, কত ব্যাত্যা, কত বিরোধ ও বিদ্রোহের অগ্নিতে সমাজ, মানুষও ধর্ম্মের আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ও আলোড়ন হইয়াছে; কিন্তু তাহারই মধ্যে বাঙ্গলার যে শান্তি, পর্ণকুটীরে বসিয়া বিশ্বসৃষ্টিকে করতলস্থ আমলকবৎ ধরিয়া রাখিয়াছিল, সে শক্তি—সে সামর্থ্য হারাইল কেন? সে আদর্শ কেমন করিয়া এই ফেরঙ্গ-যুগ নষ্ট করিল, তাহাই ভাবিবার কথা। চণ্ডিদাস যে ব্রজপ্রদীপের প্রদীপ জ্বালিয়াছেন, সেই প্রদীপ আবার জ্বালাইতে হইবে। কত বিপদ, কত সংঘাত ও বিপ্লবের মধ্যেও চণ্ডিদাস ও শ্রীচৈতন্য কেমন করিয়া বাঙ্গলার পরিপূর্ণ রস-মূর্ত্তিটিকে

নিজের জীবনের সাধনার দ্বারা স্বরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই কথাটি—সেই পথটি আমাদের বিশেষরূপে ভাবিবার ও দেখিবার বিষয়; সে বিষয়ে অন্যমত থাকিতেই পারে না। সেই পথ না জানিলে দেশের সাহিত্যের ধারাকে আমরা কখনও বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব না। সেই ধারা সরস্বতীর ধারার মত বালুর নিম্নে কোথায় লুকাইয়াছে। তাই আজ সাহিত্যের কাননে মুঞ্জরিত তরু নাই। তাল-তমাল-রসাল-পিয়ালের সে বনশোভা নাই, অশ্বত্থ-বটবৃক্ষ নাই, সপ্তপর্ণ নাই। তাই এখন পোড়া বাঙ্গলা শূন্য বনভূমিতে পুঞ্জীকৃত "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।" বালুর নিম্ন হইতে আমরা সরস্বতীকে আবার বাহির করিয়া প্রতিষ্ঠা করিব।

আজ কেন তাহা নিভিল? এর কারণ খুঁজিয়া দেখিবে, অবশ্য একেবারে তার কোন নির্দেশই পাওয়া যায় না, এমন কথা নয়। সংসারের প্রত্যেক কারণ ও কার্য্য জড়াইয়া এত বিচিত্রতায় পরিণত হয় যে, অনেক সময় সেই আসল কারণটার কোন নিরাকরণই হয় না। আমাদের এ ক্ষেত্রেও তাহা যে হয় নাই, এমন কথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে বোধ হয় সঙ্কোচ বোধ করিবেন; তবে সকলের চেয়ে বড় কারণ এই যে, আমরা আমাদের প্রকৃতিকে হারাইয়াছি। কেমন করিয়া যে তাহা হারাইলাম, তাহা লইয়া অনেক তর্ক উঠিবে। সে কারণ অনুসন্ধান করিয়া কোন লাভ নাই। আমরা আমাদের ভুলিয়াছি। সিংহ যদি একেবারে নিজের মুখখানা তার প্রাণের আয়নায় মর্ম্মের আলোকরশ্মিতে দেখিতে পায়, তবেই সকল সন্দেহ ঘুচিয়া যায়। মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য তাহাই। নিজেকে সিংহরূপে চেনা চাই—সাহিত্যের ও কাব্যের চরম কথাও তাই—আপনাকে চেনা চাই।

সেই চেনার ভিতর—সেই প্রাণের মরম-পরিচয়ের ভিতর—যত কথা সব লুকাইয়া থাকে, সেইখানেই যত খেলা। এই প্রাণ-মন-দেহ,

এই প্রতিষ্ঠাত্রয় দিয়া নিজেকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিলে, এই যে আমার মৃণ্ময় ভাণ্ডটি মুহূর্ত্তেই চিন্ময় হইয়া উঠে। মানুষ আত্মস্থ হয়, এই আত্মস্থ অবস্থাই চণ্ডিদাস, রামপ্রসাদের হইয়াছিল। এই জাগ্রত জীবনের খেলাই তিনি কৃষ্ণলীলার ভিতর দিয়া নিজের প্রাণের মহামিলন-পরিচয়ের মুহূর্ত্তগুলি গানে সুরে সৃষ্টি করিয়া গেছেন। আধুনিক কবিদের মত নিজের প্রাণের সঙ্গে কোন পরিচয় না রাখিয়া, শক্তিহীন সমালোচনার তরঙ্গ-ভঙ্গের ভাবুকতায় হাবুডুবু খাইয়া, শুধু কেবল বালুতটে ফেনা ছড়াইয়া, কীর্ত্তির ফেনা রঙ্গিন করিয়া যান নাই। আধুনিক কবিরা আত্মাকে চোখের সম্মুখে রাখিয়া, প্রেমের মধুর প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। সকল রসের—সকল রূপের সঙ্গে প্রাণমনে সবিকল্প পরিচয় করিয়া আত্মায় আত্মায় রমণে যে আনন্দ তাহা আস্বাদ করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র সমুদ্রপারের তীর হইতে শুক্‌না সমুদ্র-ফেনা কাপড়ের খুটে বাঁধিয়া বোঝা ভার করিয়াছেন।

তাই আজ ডাক দিয়া বলিতেছি, হে আমার বাঙ্গলা, আপনাকে চিনিবার সুযোগ আপনিইত হইয়াছে। আত্মা-অশ্বে বল্‌গা দিয়া, এ জীবন-রথকে চালাও, জয় অবশ্যম্ভাবী। আজ তোমার ইহাই পথ, ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই!—নাই।

আজিকার এই সাহিত্যের দরবারে আমি পুরান কথাটিই আবার বলিতে আসিয়াছি। গীতি-কবিতা কি? গীতি-কবিতার প্রাণই বা কি? গানের প্রাণই বা কি? কেননা বাঙ্গলা দেশে যাহাকে পদাবলী-সাহিত্য বলা হয় বা তাহার পরে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারায় যে সকল পদ পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সকলগুলিই সুরে গান হয়। আমাদের গান ও বিলাতী গীতি-কবিতায় কিছু পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্য না বুঝিলে দেশের প্রাণের সঙ্গে ঠিক পরিচয়লাভ হইবে না।

বিলাতী গীতি-কবিতায় কবি বিশ্বের সকল পদার্থকে তাঁহার বুকের ভিতর টানিয়া লন। তাহাই প্রাণের ভাব-রসে সিঞ্চিত করিয়া প্রকাশ করেন। সে প্রকাশে তাঁহাদের নিজত্বের ছাপ দিয়া দেন। তাহাতে হয় এই যে, প্রত্যেক রূপই কবির নিজের ভাবের ছাঁচে গড়া হয়। যে কবির আত্মায় সমস্ত বিশ্বের এই রূপ প্রতিভাত হয়, আর তাহা কবির মনের রূপের ছাঁচে গড়িয়া উঠে, সেই কবির কার্য্যই এই গীতি-কবিতা; কিন্তু এই যে গীতি-কবিতা, ইহা আমাদের দেশীয় নয়।

আমাদের দেশে চণ্ডিদাস হইতে রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালারা কেহই এই গীতি-কবিতা লেখেন নাই। তাঁহারা রচিয়া গেছেন গান, সেখানে আমরা কবিকে দেখি দ্রষ্টা। দুজনের প্রাণের খেলায় দর্শক হইয়া আনন্দরস ভোগ করিতেছেন। সেই আনন্দের সুরের রসে সব কথাগুলি ভিজান। মানুষের যে প্রাণের প্রকৃতি, সে যেন পাঁজরা ভেদ করিয়া স্বাভাবিকভাবে পাখীর গান গাওয়ার মত গলা ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহাই হইল—বাঙ্গলা গীতি-কবিতার বা গানের প্রাণ। সেই জন্ত আমি বলিতে চাই, বাঙ্গলার প্রাণের ভিতর হইতে গানই বাহির হইয়াছিল, ইংরাজী-প্রমুখ যে বিদেশী সাহিত্য আমাদের দেশে আমদানি হইয়াছে, তাহারই ফল এই বিলাতী গীতি-কবিতা। এ ধারা বাঙ্গলার নিজস্ব নয়। মনকে, চক্ষুকে, প্রাণকে ঠিক ঐ বৈদেশিক শিক্ষার ছাঁচের ভিতর দিয়া না লইয়া গেলে, ও গীতি-কবিতার ধারা সম্যক্ উপলব্ধি হওয়া দুষ্কর। গীতি-কবিতায় থাকা চাই,—তাহার ভাবের একাত্ম-রস আর সেই রসের একটি পরিপূর্ণস্বরূপ ফুটাইয়া তুলাই তাহার কাজ। যেখানে সেই রস খুব গাঢ় ও খুব অল্প কথা বা ভাবের দ্রুতকম্পনের মধ্য দিয়া প্রকাশ হইবে, সেইখানে গীতি কবিতার সার্থকতা। সেই ভাবের ও রস-সৃষ্টির মুহূর্তে

যখন কবি তাঁহার নিজের আত্মায় প্রতিফলিত আসল রূপের স্বরূপ প্রকাশ করেন, তখনি তাহা রূপান্তরে পরিণত হয়। আমরা আধুনিক গীতি-কবিতায় সেই জিনিষটি পাই না; এ কথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। কিন্তু গান যখন আসে, তখন সুর আসে ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। কথা, শুধু সেই রূপকের—সুরের সেই রূপকে ফুটাইতে সহায়তা করে। সেইখানে সুরের সঙ্গে রসিক কবির আত্মার স্বানুভূতি জাগে, পরস্পর নিজের মাধুরী আস্বাদন করে, তাহাতেই সুর ও কথা আপনিই আসে। যে গান রসের সৃষ্টমূর্ত্তিকে সুরের রূপে ঢালাই করিয়া দেয়, সেই গানই বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পত্তি। ইংরাজি গীতি-কবিতায় ভাবের যে দোলন বা গতি প্রকাশ অধিকাংশই কবির মনের গতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাঙ্গলা গান তাহা নয়, তাহার গতি আত্মার আপনার নিজস্ব। তাহার সুরের ও ভাবের মাদকতা জাগে, সেই উন্মত্ততায় সে গানের ধারা সৃষ্টি করে। ইহাই সেই 'স্বাদিতে নিজ মাধুরী'। আমাদের দেশের মেয়েলী-ছড়া, গাথাকে গীতি কবিতার স্তরে ফেলা যাইতে পারে বটে, তবে তাহার ছাঁচও বস্তুর নিজের সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। কবির প্রাণের ছাপ নাই, বস্তুর আস্বত্ব পূর্ণমাত্রায় সরস থাকে। এই বিলাতী গীতি-কবিতার আমদানীতে আমরা ঠিক নিজেদের রাখিতে পারি নাই। আমাদের আত্মস্থ হইবার পথে, এই পথ—এই ছাঁচ প্রকাণ্ড অন্তরায়। কেন না, বস্তুর সহিত ইহা আমাদের সম্যক্ পরিচয় করাইয়া দেয় না। একটা কুহেলিকাময় আবরণের ভিতর আমাদের যে নিশ্বাস, তাহা রুদ্ধ হইয়া আসে। এই যে ভাব, ইহা সত্যও নয়, অসত্যও নয়, জ্ঞানও নয়, অজ্ঞানও নয়, এই এক অদ্ভুত অবস্থায় আধুনিক গীতি-কবিতা দাঁড়াইয়াছে। কেন না, মাটীর রসের সঙ্গে সেই দেশের মানুষের দেহের ও মনের রসের একটা অন্তরের মিল আছে। সেই

রসের টানে, সেই রসের আবেশে যে মূর্ত্তি সৃষ্ট হয়, তাহাই তাহার দেশের প্রাণের পরিষ্কার নিখুঁত পরিচয় করাইয়া দেয়। বিলাতী Lyricএর আর একটা দিক্ আছে, তাহাতে অনন্তের দিক্ দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। কিন্তু অনন্ত দুইটা হয় না ; আপনাকেও দেখাইব, অনন্তকেও দেখাইব, তাহা হয় না। কল্পনা যেখানে মূক, মানুষ সহজেই সেখানে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। একটা কোন স্বচ্ছন্দ পরিষ্কার প্রাণের অনুভূতির কোন রেখাও পড়ে না ; কোন রূপের দ্বারাও প্রকাশ করিতে পারে না। বাঙ্গলার কবিতায় চণ্ডিদাস রামপ্রসাদের যুগে, কি কবিওয়ালাদের সময়েও এ ভাব তাঁহারা তাঁহাদের গানে কখনও আনেন নাই। তাঁহারা প্রাণের সঙ্গে প্রাণারামের সাক্ষাৎকার না করিয়া কোন কথা কখনও কহেন নাই।

তাই সেই বাঙ্গলার গান মানুষের জীবনের ধারায় সাধনের পথে আত্মার প্রতিধ্বনি ; সে যেন রাগে সুরে মাখামাখি করিয়া তন্ময় হইয়া দুলিয়া উঠিতেছে। আবার সেই আত্মার গভীর নিগম দেশে মিলাইয়া যাইতেছে। প্রাণের ভাবগুলাকে গলাইয়া তাহারই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও যেন গলিয়া রস-নির্ঝর ধারায় ঝরিয়া পড়ে। তাহাই আবার সুরের রঙে, ভাবের রঙে রঙিন হইয়া, এক নূতন জ্যোতির্ম্ময় ধ্যানলোক সৃষ্টি করে সেই ধ্যান-লোকেই কাব্যলোকের রূপান্তরের অনুভূতি হয়।

প্রথম কথা, আদর্শ কি ? কাহাকে বলে ? আদর্শ সেই পরিপূর্ণ রসের আকার লীলামৃত সুন্দর অনন্তশক্তির আধার শ্রীভগবান্। তিনি নিজেতে নিজেই অধিষ্ঠিত—স্বাধীন, সেই জন্য অনন্ত। লীলার মধ্যে যিনি বিশৃঙ্খলাকেও সুশৃঙ্খলায় লইয়া আসেন, সেই চিদ্‌ঘন-আনন্দ-সুন্দর পুরুষ, জড় ও জীবের যিনি আশ্রয়, লতা-গুল্ম, পশুজীবন, মানবজীবন, গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য্যলোক, মহাব্যোমে অনন্ত-কোটী নক্ষত্ররাজী যাঁহার খেলার

বুদ্‌বুদ্, যিনি প্রতিরূপেই স্বপ্রকাশ, তিনিই এই বিশ্বের আদর্শ। তিনিই সুন্দর, তিনিই কল্যাণ, তাঁহার সৃষ্ট, অনন্ত রূপই সুন্দর এবং সব সৃষ্টিই সেই জন্য সুন্দর। যেখানেই তাঁহার সুন্দর রূপের প্রকাশ হয়, সেখানেই উজ্জ্বল বিভার আলোকচ্ছটায় সৌন্দর্য্য শতগুণেই ফুটিয়া উঠে। স্বপ্রকাশ স্বাধীন আত্মার যে অনুভূতি ও সৃষ্টি, তাহাই কল্পকলার রূপসৃষ্টি। আর যে রূপের অনুভূতির আদর্শ ও রূপে অঙ্গাঙ্গিভাবে পূর্ণ সরস হইয়া ফুটিয়া উঠে, তাহাই শ্রেষ্ঠ রূপান্তর। সেই মুহূর্ত্তেই আমরা চিদানন্দ-ঘন-রসের স্ফূর্ত্তি যে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অনুভব করিতে পারি। সৌন্দর্য্য সেই জন্য সকল রকমের স্বাধীনতার উপরই ফুটে। জীবনের সাধনার ধারায় যখন মন প্রাণ দেহের সর্ব্ববাধা-বন্ধনবিহীন ভাবে আবেগে অনন্তের দিকে মুখ তুলিয়া চায়।

প্রাণের ভিতর সেই অনুভূতি যখন দেহ-মন-প্রাণে একাঙ্গীভূত হয়, তখনই জীবনের রূপান্তর। এ রূপান্তর বুদ্ধের জীবনে হইয়াছিল, যখন বুদ্ধ মহাতপস্যার পর গেহকারককে নিজের ভিতরেই চিনিতে পারিলেন। এই রূপান্তর—চণ্ডিদাসের জীবনে হইয়াছিল, যখন তিনি তিমির-অন্ধকার পার হইয়া সহজকে জানিলেন, যখন প্রাণের অনুভূতির কষ্টি-পাথরে 'বিষামৃতের' একত্রে মিলন-রেখা, মরমের দাগে সোনার নিকষের মত দাগ দিল। রূপান্তর মহাপ্রভুর জীবনে হইয়াছিল, যখন সব ঠাঁইয়ে তাঁহার কৃষ্ণ-স্ফুরণ হইতে লাগিল। এই রূপান্তর রামপ্রসাদের হইয়াছিল, যখন তিনি সত্য জগন্মাতাকে রূপের লীলায় প্রত্যক্ষ দেখিতেন, অবোধ বালকের মত মায়ের নিকট আবদার করিতেন, কখনও বা তাঁহাকে গালি দিতেন। এই রূপান্তর শ্রীরামকৃষ্ণেও ফুটিয়াছিল। রামপ্রসাদের সাধনা রামকৃষ্ণের ভিতর যেন জীবন্ত রসমূর্ত্তিতে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই যে মানুষের জীবনের ধারায় সাধনাঙ্গের একটা

সহজ দিক্ আছে, সেই রূপের পর রূপের অবিরাম রূপস্রোতে অনুভূতি ও সৃষ্টির ভিতর দিয়া মানুষ নিজেকে চিনিয়া ফেলে ;—অমনি রূপের আসল রূপ ধরা যায়।

বাঙ্গলাদেশের এই যে গানের ধারা—এই যে কল্পকলার ধারা যাহাকে জীবনের সাধনাঙ্গ হইতে তফাৎ করিয়া দেখিতে গেলে ভুল হয়, কেন না, বাঙ্গলা দেশ সাধন-ধর্ম্মের উপরই সকল কর্ম্মের—সকল সৃষ্টির—সকল কল্পকলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এই সাধনাঙ্গের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের যে সহজ সরল আদর্শ আমাদের প্রাণে ফুটিয়া উঠে, সেই আদর্শ ঐ রূপের মধ্যেই চিত্রে সুরে, কথায় নানারূপের ব্যঞ্জনায় প্রকাশ হয়, যেমনই প্রাণে অনুভূতি হয়, অমনি রূপ-সৃষ্টি। এমন করিয়া রূপের পর রূপ, মূর্ত্তি, স্রোতের মত লীলাচাঞ্চল্য বারিধি-বুকে লহরে লহরে দুলিয়া উঠে। সেই লীলাতরঙ্গের যে দোলন-রেখা, সেই রেখার লীলার মধ্যে আমিও একটা রেখা, আমার সেই তরঙ্গ, আমার সেই দোলন, আমিও সেই অনন্ত লীলা-মৃতের মধ্যে রস-রেখায় রসিয়া আছি। আমি কখন এক, কখন বহু; আবার এই এক ও এই বহুর মাঝে দাঁড়াইয়া আছেন—তিনি। দোল চলিয়াছে, খেলা চলিয়াছে, আমি 'জন্মনি-জন্মনি' আমার দেহ-মন প্রাণ দিয়া এই রস-সাধন করিতেছি। সেই রস-সাধন যেমন আমার ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের অনুভূতির সঙ্গেই আমার যে স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বানুভূতি, তাহা হইতেই আমার কল্পকলার সৃষ্টি। তখনই প্রাণের ভিতর আদর্শের পরিপূর্ণ রসানুভূতি হয়।

বাঙ্গলা দেশের গান ও চিত্রে সেই অধ্যাত্মসাধনের রূপ ও রূপান্তরই ফুটিয়াছে, তাই আমি সেই গান ও সেই গানের চরিত চরিত্রের ধারায় বাঙ্গলা দেশের স্বরূপকে দেখিতে পাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনে ও নিত্যানন্দের জীবনে যে প্রেমময় রসমূর্ত্তি

ফুটিয়াছিল নবদ্বীপ সে রূপের তরঙ্গে ভাসিয়া গেল। ঘরে ঘরে সে আদর্শের প্রতিষ্ঠা, প্রতি গৃহেই ভক্তের ভগবান্ অধিষ্ঠান করিলেন। প্রতি গৃহই গোবিন্দের মন্দির উঠিল। সে অমিয়ভরা হরিধ্বনি মুসলমান-সভ্যতার ছাঁচকে বদল করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করুন দেখিবেন—আজ ইংরাজী পড়িয়া যে Realism Idealism লইয়া এত মাতামাতি করিতেছেন, তাহার পরিপুর্ণ অনুভূতি ও কল্পকলার প্রতিষ্ঠা তাহাতে হইয়াছে কি না। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জগাই-মাধাই-উদ্ধার বর্ণন পড়িলে বুঝিতে পারিবেন। ইহাতেই বৈষ্ণব পদাবলীর সে রসচিত্রের ও সুরের খেলা নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা Ideal কি Real তাহার বিচার করিতে পারেন কি?

"একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে দোঁহে ধরিলেক গিয়া॥
'কে রে' 'কে রে' বলি ডাকে জগাই মাধাই।'
নিত্যানন্দ বোলেন, 'প্রভুর বাড়ী যাই'॥
মদ্যের বিক্ষেপে বোলে কিবা নাম তোর?
নিত্যানন্দ বোলেন অবধূত নাম মোর॥
বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়।
মদ্যপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায়॥
উদ্ধারিব দুই জন হেন আছে মনে।
অতএব নিশাভাগে আইলা সে স্থানে॥
অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটুকী তুলিয়া॥
ফুটিল মুটুকী শিরে রক্ত পরে ধারে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ সোঙরে॥

দয়া হইল জগাইয়ের রক্ত দেখি মাথে।
আর বার মারিতে ধরিল দুই হাতে॥
কেন হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দৃঢ়।
দেশান্তরি মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়॥
এড় বড় অবধূত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ লাভ বা তোমার॥
আথে ব্যাথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা॥
নিত্যানন্দ-অঙ্গ সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুইয়ের ভিতরে॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি মনে।
চক্র! চক্র! চক্র! প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথে ব্যাথে চক্র আসি উৎপন্ন হইল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে না দেখিল॥
প্রমাদ গণিল সব ভাগবতগণ।
আথে ব্যাথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন॥
মাধাই মারিতে প্রভু! রাখলি জগাই।
দৈব সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥"

এই যে বৈষ্ণবের শক্তি ও প্রেমের চিত্র ও চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এই প্রেম ধর্ম্মের স্রোতে শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও সাহিত্যকল্পকলা গঠিত হইয়াছিল; তাহার পরিচয় আমরা পাই। এই যে চরিত-চিত্র, ইহাকে আপনারা কি বলিবেন? Realism না Idealismএর কল্প-

কলা? আমি বলিব এই যে, অভিনব রূপ চরিত্র-সৃষ্টি, ইহা বাঙ্গলায়ই সম্ভব, কেননা, ইহা বাঙ্গলায় ঘটিয়াছিল, এবং ইহা বাস্তব সত্য। সেই সত্যের বর্ণনা বৃন্দাবন দাস অতি নিখুঁত তুলিকায় সংযমের সহিত তাহার সমস্ত ভাবটি ও চিত্রটি একাত্ম করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। যখন দরদরধারে রক্ত ধারা বহিয়া পড়িতেছে, তখনও সেই দুই জনের মাঝে দাঁড়াইয়া 'মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এই দুই শরীর' ইহাতে কি প্রেমের জাগ্রত রূপান্তর হয় নাই? ভগবান্ আমাদের এই দুই হাত দিয়া আয় আয় বলিয়া ডাকিতেছেন, আমরা কত রকমের খেলাই তাঁহার সঙ্গে খেলিতেছি। কত দুঃখই তাঁহাকে দিতেছি, তবুও প্রেমময় আয়—আবার সেই আয় বলিয়াই ডাকিতেছেন, আর হাসিতেছেন। বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দের এ প্রেমলীলা কি ঠিক সেই শ্রীভগবানের আদর্শের অনুভূতির রসে সিঞ্চিত নয়? কোল দিয়া—মার খাইয়া, তেমনি হাসিয়া হাসিয়া খেলা করিতেছেন। নিত্যানন্দের জীবনে সাধনের ধারায় যাহা রূপান্তর হইয়াছে, চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাসের কল্পকলার রস-সৃষ্টিতে সেই রূপান্তরই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই রস-সাধনার ধারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ভিতরে যথেষ্ট ফুটিয়াছে। সেই জীবনকে আদর্শ করিয়া মহা-পুরুষের প্রদর্শিত পথে সাধন করিয়া, আত্মার ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিতে ও কেহ কেহ সেই রূপান্তরের পরিচয় ও জীবনের সাধনের ও কল্পকলার ধারায় গীতিকবিতা ও গানের সৃষ্টিতে বেশ ফুটিয়াছিল, সৃষ্টিতে বেশ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকলই সেই পরিপূর্ণ আদর্শ সৃষ্টিতে পঁহুছিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রের যে মধুর রসের সাধন, তাহার সঙ্গে নিত্যানন্দের এই অপূর্ব্ব সখ্য, দাস্য বাৎসল্যমিশ্রিত যে অকিঞ্চন সমরস, তাহা আর কোন সাহিত্যে নাই। এই রসসৃষ্টি পরবর্ত্তী নরহরি, নরোত্তম, লোচন, বলরাম দাস

প্রভৃতি কবিরা সেই আদর্শেই নিজেরা সাধন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের লোকাতীত রূপলাবণ্য, তাঁহার সেই মেঘগম্ভীর স্বর, তাঁহার সেই অসাধারণ অমানুষিক প্রতিভার সংযম ও হৃদয়ে সমাহৃত অনুপম প্রেম, যে বন্যা বাঙ্গলায় আনিয়াছিল, সে ভাবের বন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। সেই ভাবের ধারায় বাঙ্গলার সাধনার সঙ্গ এক অতি নিগূঢ় যোগ আছে। চণ্ডিদাস ও বৌদ্ধ-সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনার ভিতর দিয়া বাঙ্গলা তাহার এই রস-সাধনা এই সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বজাতি, সর্ব্বলোককে প্রেমিক করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গলা তখন মৃদঙ্গের মেঘগুরুনিস্বনে ও হরিধ্বনিতে মুখরিত ছিল। পবনে গগনে সে দিগ্‌দিগন্তে প্রেমের বাণীকে বহন করিয়া লইয়া দিত। সেই মহাপ্রেমিক যখন মহাসমুদ্রের বুকে রূপের নৃত্য দেখিয়া, আপনাকে সেই সৌন্দর্য্য-রসসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, পূর্ণচন্দ্রকরোজ্জ্বল উদ্বেলিত মহাসাগরের মহাপ্রাণের সঙ্গে যখন একাত্ম হইয়া রূপের সহিত মর্ম্মে মর্ম্মে মিলাইয়া নির্ব্বিকল্প-মহামিলন লাভ করিয়াছিলেন,—সেই এক চন্দ্রমাশোভিতা নিশা! শ্রীভগবানের রূপের তৃষ্ণা কেমন রূপের ধারায় ভিতর দিয়া রূপে রূপে মিলিত হইয়াছিল! সে লীলা, সে খেলা, সে প্রেমের অজেয় তুলনা কোন দেশের সাহিত্যে মিলিতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না।

এইটুকু প্রাণে প্রাণে ধরিয়া রাখিতে হইবে যে, এই রূপ, এই সুন্দরের হাসি, তাঁরই রূপ, তাঁরই হাসি, তাঁহারই এই উন্মাদনা, তাঁরই এই উন্মত্ততা, তাঁহারই এই আবেগ, তাঁরই এই আকুলতা। চন্দ্রমাও তাঁহার, আমিও তাঁহার, তিনিও তাঁহার। এ যে রূপে-রূপে মিলন—প্রাণে-প্রাণে মিলন। শ্রীনিত্যানন্দের এই যে উত্তম অধম বিচার না করিয়া, আচণ্ডালে প্রেম বিলাইবার কাহিনী, বাঙ্গলার গানের একটা দিক্, বাঙ্গলার ধর্ম্মসাধনের একটা অঙ্গ, তাঁহার এই লীলায় লীলায়িত।

"ভকতি রতনখনি, উড়াইয়া প্রেমমণি, নিজগুণ সোণায় মুড়িয়া।
উত্তম অধম নাই, যারে দেখে তারি ঠাঁঞি, দান করে জগত বেড়িয়া ॥"

লোচনদাস গাইয়াছিলেন—

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।
চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা, হরিনাম মহামন্ত্র দিছে বিলাইয়া ॥"

এই যে অভিমানশূন্য বৈষ্ণবের প্রাণ, এই যে অযাচিত প্রেমদান এ আদর্শ বাঙ্গলারই নিজের। নিত্যানন্দ অবধূত তাহারি জীবন্ত—জাগ্রত— রূপান্তরে মূর্ত্তপ্রকাশ ছিলেন।

অবশ্য, এ কথা সত্য যে, এই বৈষ্ণব-সাধনা বাঙ্গলা নিজের আত্মার অধ্যাত্মসাধন হইলেও, তাহার একটা গতি আমরা ধরিতে পারি। সকল শক্তির ধারাই এক। একবার করিয়া কূটস্থ, একবার করিয়া কূর্ম্মবৎ সঙ্কোচ, আর একবার করিয়া সম্প্রসারণ। চণ্ডিদাসের জনমের পর যে ভাব, যে প্রেমের সাধন তাহার সঙ্কোচ হইয়াছিল, আবার সম্প্রসারিত হইয়া শ্রীচৈতন্যে তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছিল। সেই ভাব বাঙ্গলাকে কাব্যে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে সকল রূপের সৃষ্টির মধ্যে প্রসারিত করিয়া, আবার সঙ্কুচিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের সময়েই, বাঙ্গলার সকল সমৃদ্ধি ছিল, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

তাহার পর একটা যুগ আলো ও অন্ধকারে কাটিল। শক্তি আবার কূর্ম্মবৎ সঙ্কোচে পরিণত হইল। শাক্ত ও বৈষ্ণবের পরস্পর বিবাদ, জাতির নানারূপ হীনতার মধ্যে মুসলমানের অত্যাচার, সব মিলিয়া দেশ আবার অন্ধকারে ডুবিয়াছিল; নিবিড় তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার!

সেই অন্ধকারের মাঝেই রামপ্রসাদ আসিলেন। কিন্তু তাহার মধ্যে আবার মুকুন্দরাম, কাশীরাম, ঘনরাম, রামেশ্বর বাঙ্গলার কাব্যের ধারাকে অন্যদিকে পুষ্ট করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গলার প্রাণের গানের সুর তখন

মিলাইয়া আসিয়াছিল। রামেশ্বরের শিবায়ন অনেকটা বাঙ্গলা যাত্রার পূর্ব্বাভাস বলিলেও বলা যায়। কিন্তু রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন ও রামপ্রসাদের যে গান, তাহার তুলনা হয় না। বাঙ্গলা আবার সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। এই মুসলমান-প্রভাবের মধ্যেই ভারতচন্দ্রের জন্ম।

এই যে কাল ও কালধর্ম্ম, তাহার মধ্যে আমরা একটা সত্য ধরিতে পারিতেছি। বাঙ্গলার যে খাঁটি প্রাণ, বাঙ্গলার বাঙ্গালীজাতির যে বৈশিষ্ট্যের ধারা, তাহার প্রাণধারাকে লইয়া চলিয়াছে, তাহারও একটা স্রোত চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় মুসলমানী রাজার যে বিজাতীয় সভ্যতা, তাহার দ্বারা অভিবিক্ত যে ধারা, তাহাও চলিয়াছে। বাঙ্গালী-জাতির খাঁটি কবি রামপ্রসাদ, আর বাঙ্গালী জাতীর অখাঁটি কবি বা মুসলমানী সভ্যতার ধারায় কবি ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্রের ক্ষমতা অসাধারণ হইলেও তাঁহার কাব্য সুন্দর হইলেও, তাহার মধ্যে বিজাতীয় ভাব, হাবভাব, ধারা-ধরণ ছিল ও আছে। রামপ্রসাদের ভিতর হিন্দুর পৌরাণিক সত্য-সংস্কারজনিত প্রাণের পরিচয় আছে। এক দিকে মুসলমান বাঙ্গালী কবি আলোয়ালের পদ্মাবতী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলের মাঝে, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ও কালীকীর্ত্তন সেই যুগের দুই ধারাকে স্রোতের মত লইয়া গেছে; কিন্তু দুই স্রোত গঙ্গা-যমুনার মত মিলিতে পারে নাই, পারিবেও না। বৈশিষ্ট্য থাকিয়া যায়, বৈশিষ্টই ভগবানের অভিপ্রেত! বিশেষেই রূপ সৃষ্ট হয়।

রামপ্রসাদ কালী কীর্ত্তনের প্রথমেই গাইলেন,—

"গিরিবর! আর পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥

অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়া ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥
আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে॥
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথা রে॥
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে করে॥
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্য-পুঞ্জচয়
জগত জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা
শোয়াইল পালঙ্ক-উপরে॥"

এই বাৎসল্য-রসের চিত্র ও গানটিকে এই ফেরঙ্গ-যুগে ঘোরো কবিতা বলিয়া ব্যঙ্গ করা সহজ, কিন্তু যাঁহারা সত্য মাতৃত্ব, পিতৃত্ব ও বাৎসল্য-রস জীবনে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া প্রাণের ভিতর অনুভূতিতে সে রস-আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ইহার তুলনা কেহ দিতে পারে না। প্রথম ইহা সত্যই বাঙ্গলার নিতান্ত ঘরের ছবি এবং সেই

সঙ্গে সঙ্গে ইহা ঘর ছাড়িয়া আসল ঘরেরও ছবি। আমরা প্রথম হইতেই এই গানটিকে সকল দিক দিয়া দেখিতে চাই।

গিরিরাণী মেনকা গিরিবরকে ডাকিয়া কহিতেছেন, "ওগো, আমি যে আর উমাকে প্রবোধ দিতে পারি না", শুধু এই প্রথম ছত্রটি পড়িলেই বুঝা যায়, ইহাতে রাণী মেনকার স্নেহ, বাৎসল্য, মধুর রসের যে বেদনা, তাহার সুরেতে যে প্রতি অক্ষরেই মাখামাখি। তাহার পরের চিত্র সন্তানের অভীষ্ট বস্তু না পাওয়ার জন্য মেয়ের সেই অভিমান, ঠোঁট ফুলাইয়া কান্না, স্তন হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়া, এ সকল দিক্ কেমন অঙ্কিত জীবন্ত চিত্রের মত ফুটিয়াছে, সন্তান যেমন হাত বাড়াইয়া চাঁদের পানে চায় আর কাঁদে। এই কয়টি ছত্রের পর পুনর্ব্বার—

'আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে'

এইটা ফিরিয়া আর একবার বলায়, মার বেদনার গভীরতা কেমন ব্যক্ত হইয়াছে। তারপর,—'আয় আয়, মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলী, যেতে চায় না জানি কোথারে।"

এইখানে আমরা আর একটি নূতন রহস্য পাই, মেয়ে মা মা বলিয়া অঙ্গুলী ধরিয়া যখন চাঁদের দিকে দেখায়, সেই হাত বাড়াইয়া দেখার ভিতর সেই ছোট মেয়েটির প্রাণের ভিতর যে রূপের ডাক, তার তৃষ্ণা, সেই পথে মিলিবার অজানিত আশা ও শব্দহীন ভাষা, তাহার ভিতর মেনকা রাণী তাঁহার বুদ্ধির দ্বারা 'কোথা যেতে চায়', ইহা ভাবিয়া পাইলেন না। কোন্ অজানিত মহাশূন্যের পানে এই ছোট মেয়ের প্রাণ ধায় কেন, তাহা মেনকা নিজের মনে মনে ঠিক ধরিতে পারেন নাই। তাই তিনি 'চাঁদ কিরে ধরা যায়' বলিলে, সে দুরন্ত মেয়ের মত বসন-ভূষণ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। মা মেনকা তখন যেন আর সামলাইতে পারিলেন না। পিতা গিরিবর উঠিয়া কন্যাকে ভুলাইলেন। মুকুরে

মুখ দেখিয়া মা উমা তখন শান্ত হইল। তখন দ্রষ্টা শ্রীরামপ্রসাদ বলিতেছেন,—

'জগজ্জননী যার ঘরে।'

মেয়ের মুখ দেখিয়া সেই বিশ্বমাতার রূপের কল্পনা ও ধ্যান মনে পড়িল। শুধু মনে পড়িল নয়, জাতির জীবনের ধারায় যে পৌরাণিকী কল্পনা, আজও পর্য্যন্ত তাহার মেরুদণ্ড হইয়া আছে, তাহার ভিতর দিয়া সেই জগন্মাতার ভাবটীকেও মিলাইয়াছেন। তাহার পর মেয়ে ঘুমাইয়া পড়িল। এই যে বাৎসল্য রসের ছবি, ইহা বাঙ্গলার ঘোরো রস হইলেও ইহার 'বিশ্ব'মোহ নাই। বাঙ্গলার জাত মারা যায় নাই। বাঙ্গলার সকল রং গঠন হাবভাব সকলই আছে, অথচ কাব্যের, গানের যে প্রাণ যেরূপ রূপান্তর, তাহাও হইয়াছে। যখন পেটের মেয়ের মুখে বিশ্বমায়ের রূপ এমন করিয়া ফুটিয়া উঠে, তখনই রূপান্তর হয়।

আমি তুলনায় সমালোচনা করিতে চাই না। আমি আধুনিক বাৎসল্য-রসের একটি বাঙ্গলা কবিতার প্রাণ এমনি করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে চাই।

খোকা মায়ে শুধায় ডেকে,
এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্ খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?
মা শুনে কন হেসে কেঁদে,
খোকারে তার বুকে বেঁধে,
ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।
ছিলি আমার পুতুল খেলায়,
ভোরে শিব-পূজার বেলায়,
তোরে আমি ভেঙ্গেছি আর গড়েছি।

তুই আমার ঠাকুরের সনে,
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি।
যৌবনেতে যখন হিয়া—
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া,
তুই ছিলি সৌরভের মত মিলায়ে।
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে,
জড়িয়েছিলি সঙ্গে সঙ্গে,
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে—
সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সম বয়সী।
তুই জগতের স্বপ্ন হ'তে,
এসেছিস্ আনন্দ-স্রোতে,
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি।

এ সকল ছত্রের ভিতর এবার আমরা দেখিব যে, বাৎসল্য-রস কেমন ফুটিয়াছে। অবশ্য, ইহাতে ঘোরো বাৎসল্য-রস নাই,—কিন্তু ঘোরাল রকমের রস আছে বটে। এখন দেখিতে চাই, এ কি রকম বাৎসল্য-রস। মাতা তাহার সন্তানকে বলিতেছে,—

'ইচ্ছা হয়েছিলি মনের মাঝারে।'

কোন খোকা আজও পর্য্যন্ত

'এলেম আমি কোথায় থেকে
কোন খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'

বলিতে পারে কি না জানি না। ইহাতে কবি বোধ হয়, বুড়ো খোকার

মত আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আর তাহার জবাবগুলিও মায়ের মুখে তাঁহার নিজের বুলি বসাইয়া দিয়াছেন। আমি যাহাকে ইংরাজী গীতি-কবিতার কথা বলিয়াছি, ইহা সেই বিলাতী ছাঁচে তৈরী। ঋগ্বেদের ১২৯ সূক্তের ৪এর শ্লোকে আছে,—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ" সর্ব্বপ্রথমে ইচ্ছার আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে মনের প্রথম উৎপত্তিকারণ নির্গত হইল।

রমেশচন্দ্র দত্ত ইহার বাঙ্গলা তর্জ্জমা করিয়া গেছেন। যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, তাঁহার মস্তিষ্ক চালনার দ্বারা এই ইচ্ছার স্থানে মায়ের মুখে প্রজাপতি ঋষির বাক্যটি বসাইয়া দেওয়া খুব সম্ভবও নয়। কেন না, বেদ তাহার পরে বলিতেছেন যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন—আশ্চর্য্য নয়!

বিশ্বমায়ের অন্তরের ভিতর মা হইবার ইচ্ছা অথবা মায়ের অন্তরের মা হইবার ইচ্ছা থাকিতে পারে, এবং নারী তাহার নারী-জন্মের সংস্কার-গত বুদ্ধিতে এ কথা মনে করিতে যে পারে, তাহা বলিতে পারেন। তবে তাহাকে এই ইচ্ছার সঙ্গে একাত্ম করিবার বুদ্ধি মায়ের মধ্যে থাকে কি?

তাহার পর কবি যতগুলি শ্লোক রচিয়াছেন, সবগুলির ভিতর কোন একটিতেও মার কথা নাই। মায়ের মুখের দার্শনিক কবির বুদ্ধির ভাষা ছন্দে গাঁথা। ইহাতে বাৎসল্য-রসের গভীরতা দূরে থাকুক, রসিকজন ইহাতে বুদ্ধির খেলাই দেখিতে পান, রসের কোন আভাসই পান না। যৌবনে মাতার অঙ্গে অঙ্গে সৌরভের মত মিলিয়া থাকা, নিত্যকালের পুরাতন হওয়া, জগতে স্বপ্ন হইতে এই আনন্দ স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া আবার তাহার মায়ের রূপে ফুটিয়া উঠা একটা বুদ্ধির কারচুপি হইতে পারে, ইংরাজী সাহিত্যের ধারার বুদ্ধি-রস হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে বাৎসল্য রস বলে না। যে বাঙ্গালী সত্য পিতা হইয়াছে, যে

বাঙ্গালী সত্য মাতা হইয়াছে, সে এমন করিয়া ভাবেও না, মনেও করে না। তারপর কবি ঐ কবিতার শেষে বলিতেছেন,—

জানিনে কোন মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু দুটির আড়ালে!

এই শেষ কয় ছত্রে একটা সত্য সত্যই মায়ের প্রাণের ভাবের কথা বটে, তাহা অস্বীকার করি না, বিশ্বের ধন বলিয়া সন্তানকে মনে করা খুব অসম্ভবও নয়, তবে কোন স্বাভাবিক মাতাই নিজের ছেলেকে 'বিশ্বের ধন' মনে করেন না। জগতের সেরা মাণিক মনে করিতে পারে, কিম্বা সন্তানের মুখে ভগবানের সৃষ্টিসম্পর্কের গূঢ় বাৎসল্য রস প্রাণে জানিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রকাশ এরূপ নহে। ইহার আগাগোড়াই কবিতা নয়, রস নয়, বুদ্ধির দ্বারা, ছন্দের দ্বারা জোর করিয়া কবিতার প্রাণ সৃষ্টি করিয়া তোলা। ইহা বাঙ্গালার গান, রাগিণী, কবিতা নয়; তাই আবার বলিতে হয় যে, বুদ্ধিমান অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন।

এই ধরায় যে স্বর্গের কল্পনা ও আভাস পাই, পরিপূর্ণ আনন্দের উচ্ছল ধারায় নিজেরা আর্দ্র হইয়া যাই, এমন করিয়া সেই গলাইয়া মজাইতে পারে শুধু প্রেম। প্রেমই সেই সুরের ধ্যানে আমাদের এই সুখ-দুঃখ-সিঞ্চিত জীবনকে সত্য জীবন করিয়া তুলে। পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে সত্য বস্তু দেখি প্রেম, এই মানুষের যে প্রেম, এই মানুষের যে বাৎসল্য, এই মানুষের যে মাতৃত্ব, তাহার সঙ্গে জগন্মাতার যে ভাব, সে সত্য অনুভূতি, রূপে, ভাষায়, সুরে রামপ্রসাদের গানে ফুটিয়াছে, তাহা এই আধুনিক শিশু কবিতার জন্মকথায় নাই, থাকিতেই পারে না কেন না, মাতার প্রাণের পরিচয় ইহাতে নাই, আছে শুধু জ্ঞানের বোঝা

তাহার দার্শনিক তত্ত্ব, মাতার যৌবনের সৌরভের স্মৃতি আর যে রহস্যের নিগূঢ় পরিচয় দিয়াছেন, সেই রহস্যের কথা।

'সবার ছিলি আমার হলি কেমনে?'

এই যে রহস্যের ভিতর এক প্রশ্ন তুলিয়া খাড়া করা, এ রহস্য জগতের সকল রহস্যে মিলাইয়া দেখার মত ভাব, কবির নিজস্ব বুদ্ধি ও জ্ঞানের অনুসন্ধানের পরিচয় হইতে পারে, ইহাকে রহস্য-রস বলা যাইতে পারে। এত বিচার বিপত্তি মা'র হয় না। মাতা সন্তানের মুখে বিশ্বের সকল পরিচয়ই পাইতে পারেন ও বিশ্বের মধ্যে সন্তানের সকল অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক-গুলাও দেখিতে পারেন, কিন্তু তাহা এমন বিচার করা পর্দ্দা-ঠিক-করা শুষ্ক জ্ঞানের মধ্য দিয়া নয়, সে মাধুর্য্য আর এক রসের ধারা। সেই রসেই বাঙ্গলার জাত বজায় থাকে ও আছে; এই আধুনিক কবিতায় বাঙ্গলার জাত মারা গিয়াছে। আমাদের বক্তব্য এই যে, কবিতায় এমন করিয়া আমাদের জাত হারাইতে আমরা প্রস্তুত নহি। আর একটা কথা রামপ্রসাদের ঐ গানে শুধু বাৎসল্য-রস নহে, মধুর রসের ভিতর যুগল সম্বন্ধের ভিতর বাৎসল্য কেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে ফুটিয়াছে, তাহা একটু মনকে ঠিক করিয়া দেখিলে বুঝিবার অসুবিধা হইবেও না। দেশভেদে যেমন চেহারার পার্থক্য আছে, বিশিষ্ট জাতি আছে, তেমনি কবিতারও জাতি আছে।

ইহা ত গেল বাঙ্গলার খাঁটী কবি রামপ্রসাদ; ইহাকে অবশ্য বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কেহ ফেলিবেন না; কিন্তু বাঙ্গলার কবি-চিন্তামণি চণ্ডিদাসের যশোদার বাৎসল্য সম্বন্ধে একটি গান আছে। সেটি এই:—

"তুমি মোর প্রাণ-পুতলি সমান
যতক্ষণ নাহি দেখি।

হৃদয় বিদরে তোর অগোচরে
মরমে মরিয়া থাকি ॥
যেন বা কি ধন অমূল্য রতন
পাইয়া আনন্দ বড়ি ।
ভাসি অশ্রুজলে আনন্দ-হিল্লোলে
গৃহকাজ যত ছাড়ি ॥
শুনহ কানাই আর কেহ নাই
কেবল নয়ন-তারা ।
আঁখির নিমিখে পলকে পলকে
কত বার হই হারা ॥
মরুক এমন যত ধেনু গাই
তোমার বালাই লয়ে ।
কালি হ'তে বাপু ধেনু গোঠ মাঠ
না পাঠাব বন দিয়ে ॥
কি বলিব মন্দ তোমার যুকতি
কানু পাঠাইয়া বনে ।
না জানি কখন কিবা জানি হয়
হেন লয় মোর মনে ॥
বনে ভয়ঙ্কর বৈসে ভয়ঙ্কর
শার্দ্দূল ভুজঙ্গ রহে ।
জানি বা কখন করয়ে দংশন
এ বড়ি বিষম মোহে ॥
আনের অনেক আছে কত জন
আমার পরাণ তুমি ।

ভাল মন্দ হৈলে আঁখির পলকে
তখনি মরিব আমি॥
চণ্ডীদাস বলে অতি বড় স্নেহ
দেখিল যশোদা মায়।
এ না কভু শুনি জগতে না দেখি
জগতে এ যশ গায়॥"

ইহাও সেই ঘোরো বাৎসল্য-রস, তাহা ঠিক, কিন্তু এ ছাড়িয়া যে কখন বাৎসল্য হয় না, তাহাও ঠিক।

"আনের অনেক আছে কত জন
আমার পরাণ তুমি।
ভাল মন্দ হলে আঁখির পলকে
তখনি মরিব আমি॥"

মাতৃ-হৃদয়ের ভিতরের যে কথা, তাহা কি ব্যক্ত হয় নাই? খাঁটী বাঙ্গলা ভাষায় ছেলের "ভাল মন্দ কিছু হওয়া" মা ছেলের সম্পর্কে সে কি প্রাণের অন্তরতম রসের কথা ফুটিয়া উঠে; তাহা যে মাকে জানে, সেই সে বুঝে। যে জানে না, তাহার বুঝিবার উপায় মার আশীর্ব্বাদ। আধুনিক কবিতায় যে ছত্র দুইটিতে—

"হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখ্‌তে যে চাই
কেঁদে মরি একটু স'রে দাঁড়ালে!"

আর চণ্ডিদাসের—

"আঁখির নিমিখে পলকে পলকে
কত বার হই হারা॥
শুনহ কানাই আর কেহ নাই
কেবল নয়ন-তারা।"

এই দুই শ্লোকের সঙ্গে যে ভাবের মিলন আছে, তাহাতে কি প্রমাণ হয় না, বৈষ্ণবের বাৎসল্য সজীব—সত্যি নাড়ী-কাটার ব্যথার সাড়া? ইহাতে মাতার যৌবন-স্মৃতি সুরভি মার মনের মধ্যেই আছে, ছেলেকে সে কথা জানাইবার অবসর হয় নাই। সন্তানকে পাইয়া মার মাতৃত্ব পরিস্ফুট হইয়া মাতৃত্বের সার্থকতা হইয়াছে, মা দার্শনিকতা করিয়া কবির মুখে তার জন্মকথা কহিবার অবসর পান নাই।

চণ্ডিদাসের যশোদা ও রামপ্রসাদের গিরিরাণী এই দুই চরিত-চিত্রের যে রঙ তাহা খাঁটী বাঙ্গালী মায়ের রঙে অঙ্কিত। মায়ের মুখের অঙ্কন, তাঁহার মুখের কথা কটি শুনিলেই তাহা বেশ কেমন আমাদের বাঙ্গালীর প্রাণের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করে, মায়ের মতই মনে হয়। 'কোথা হইতে?' বা 'কোথায়?' এ সব প্রশ্ন তাহার মধ্যে পরিস্ফুট ব্যঞ্জনা না থাকিতে পারে। এখানে ভবিষ্যৎ ও অতীত বর্ত্তমানের মাতৃত্বেই পূর্ণতস্বরূপে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাতেই ডুবিয়া গেছে। এখানে জীবন মাতৃত্বে ও বাৎসল্যের মধুর রস-মুহূর্ত্তে কেন্দ্রগত স্থির ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল। এই প্রেমের চেয়ে সুন্দর কি আছে, এই মাতৃত্বের মত পূর্ণতা আর কি আছে? 'কোথা হইতে' ও 'কোথায়' ছেলের মুখের রূপ দেখিয়া মায়ের মনে ঠিক ঐ ভাবের রস ফুটে, এমন ত কখন মনে হয় না।

তাহার পর রামপ্রসাদের গান আমরা কয় ভাগে ভাগ করিতে পারি। কালীকীর্ত্তন, শিবসঙ্গীত, কৃষ্ণসঙ্গীত ও তত্ত্বসঙ্গীত। রামপ্রসাদ তাহা ছাড়া বিদ্যাসুন্দর ও অন্যান্য অনেক রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার গীতি-কবিতার এই দ্বিতীয় পল্লবে আমরা রামপ্রসাদের যুগের সঙ্গে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিব। আজু গোঁসাই, রাম দুলাল, কমলাকান্ত প্রভৃতি সকলেই রামপ্রসাদকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

কিন্তু এই যে ফেরঙ্গ কবিতা বাঙ্গলার এবং মানুষের খাঁটী মনুষ্যত্বকে

নষ্ট করিয়া তৈয়ারী হইল, তাহার গুরু কে? তাহার গুরু রামমোহন রায়। "জবরদস্ত মৌলবী" রামমোহন বাল্য হইতে আরবী ফারসী পড়িয়া যে ছাপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই ছাপে বাঙ্গলার ধর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া সমাজ-সংস্কারক রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্ম সমাজ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা একসঙ্গে যেমন নমাজ পড়ে সেই অনুকরণে সমাজ গড়িলেন। পৌত্তলিকতার উপর এত বড় চোট দিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর অযথা অন্যায় বিচার করিলেন। অবশ্য, এ কথা মানি যে, বৈষ্ণব তখন শুকনা মালার ঠকঠকিতে পরিণত হইয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশের তান্ত্রিক সাধনাঙ্গের ধারাও তখন কিছু বিশুদ্ধ ছিল না, অথচ রামমোহনের গ্রন্থাদি হইতে বৈষ্ণবের প্রতি অযথা বিদ্বেষ ও সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার প্রতি অযথা আসক্তি,—এ সকলের প্রমাণ প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। এমন কি, এই দুই সাধন-পদ্ধতির সমালোচনায় তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীদিগের জাত তুলিয়া গালি দিতে ছাড়েন নাই। যদি বাঙ্গলা সাহিত্যে দেবদেবী—চরিত্রের দুর্গতিই রামমোহনের আবির্ভাবের কারণ হয়,—যেমন আধুনিক কালের কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক অতি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন,—তবে এ কথা বলিতেই হইবে যে, রামমোহনের দ্বারা সে নষ্ট-ধর্ম্ম ও লুপ্ত দেব দেবী-চরিত্রের উদ্ধার সাধন বা সময়োপযোগী কোন সমন্বয়ই সাধিত হয় নাই। যাহা রামমোহনের প্রায় শতাব্দীকাল পরে পূতপ্রবাহিনী গঙ্গার তীরে তীরে কোন কোন মহাপুরুষের জীবনে তাহার আভাস, উন্মেষ, তাহার বিকাশ, তাহার প্রতিষ্ঠা, তাঁহাদের জীবনে সেই মহা-প্রাণের প্রতিষ্ঠা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু রামমোহনে তাহা ছিল না,—হয় নাই।

তাই আমার মনে হয় যে, রামমোহন প্রতিভাশালী মহাপুরুষ হইলেও বাঙ্গলার প্রাণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না। কেন না বাঙ্গলার নিজস্ব যে বৈষ্ণব ভাব যাহা বাঙ্গলার প্রাণকে ধর্ম্মকে জাতিকে সমাজকে সকল রকমে বাঙ্গলার সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন—মায়াবাদী বেদান্ত ও কোরানের সঙ্গে হিন্দুর শাস্ত্রকে বেশ করিয়া গুলাইয়া দিলেন। অসীম ধীসক্তিসম্পন্ন মেধাবী রামমোহন তাহার বুদ্ধির অসামান্য প্রতিভার ঘোরতর মল্ল যুদ্ধ দেখাইয়া গেছেন একথা অস্বীকার করিতে পারিব না। তবে এই কথা বলিতে আমি বাধ্য হইব যে, খৃষ্টান পাদরীদের বিরুদ্ধে হিন্দুর হইয়া তিনি যতই তর্ক করুন না কেন, এই ফেরঙ্গ আসিত না,—কখনই আসিত না, বাঙ্গলার ভাষাকে ইংরাজী করিতে পারিত না, বাঙ্গলার ভাবকে কখন ফেরঙ্গ করিতে পারিত না,—যদি তিনি আমাদের দেশের সাধনকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেন ও করিয়া ইংরাজী সভ্যতা সাধনা এমন করিয়া দুই হাতে বরণ করিয়া গৃহে না তুলিতেন।

রামমোহম আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার সাহিত্য, ধর্ম্ম ও গান রামপ্রসাদের সুরে—তাঁহার আদর্শে মাতিয়া উঠিয়াছিল। ঠিক যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরই রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন—রামপ্রসাদ যে সুর গাহিয়া গেলেন, রামমোহন ঠিক তার উল্‌টা সুর ধরিলেন। রামমোহন গান করিলেন,—

"অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যতে নির্ভর কর॥"

আর রামপ্রসাদের গানের সুর এই একটি গানে বেশ বুঝা যাইবে।



"আর ভুলালে ভুল্‌ব না গো।
আমি অভয়-পদ সার করেছি, ভবে হেল্‌ব দুল্‌ব না গো॥

বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌বো না গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুল্‌বো না গো। ১
ধনলোভে মত্ত হোয়ে দ্বারে দ্বারে বুল্‌ব না গো,
আশা-রাহুগ্রস্ত হোয়ে, মনের কথা খুল্‌বো না গো॥ ২
মায়াপাশে বদ্ধ হোয়ে, প্রেমের গাছে ঝুল্‌ব না গো,
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌ব না গো॥"

ইহার সঙ্গে চণ্ডিদাসের,—

"সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি,
দুখ যায় তারি ঠাঁই।"

তুলনা কতক হইতে পারে, ভাবের ধারা দুইজনের একই পথে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু রামমোহনের গান, গান নহে, জোর করিয়া মানুষকে বেদান্তের ঔষধ গেলান।

রামপ্রসাদের পর বাঙ্গলায় আর খাঁটী বাঙ্গালীর কবি জন্মে নাই। রামপ্রসাদ এই জগৎকে যেমন সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশ্বের প্রাণকে যেমন মাতৃরূপে, জননীর মাতৃত্বের ভিতর দিয়া দেখিয়াছিলেন, নিজের প্রাণকে যেমন মাতৃত্বের রূপান্তরে লইয়া গিয়া, আপনি আত্মস্থ হইয়া তাহাতে নিজেকে ও নিজের প্রাণকে বিশ্ব-মাতাকে এক করিতে পারিয়াছিলেন তাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ তাঁহার রচিত আগমনী ও বিজয়া! বাঙ্গলাদেশে, বাঙ্গলাভাষায় তাহার আগে বা পরে, অমন আগমনী কেহ রচনা করিতে পারেন নাই! আজিও বাঙ্গলার পল্লী-গৃহে সহরের কোলাহলের মাঝে শরতে মহামায়ার সে আগমনী, পরিপূর্ণ সুরে দিনের পর দিন, বর্ষের পর বর্ষ গাইয়া বেড়াইতেছে।

রামপ্রসাদের গানের ভিতর প্রেমের, মানুষের যে রূপান্তর হইয়াছিল,

আমাদের নিজেদের উপর, আমাদের নিজেদের জীবনের উপর সে বিশ্বাস সে আত্মনির্ভর হারাইয়াছি। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ঐ যে চাষা মাটীর সঙ্গে কেমন করিয়া প্রাণ দিয়া পরিচয় লাভ করিতেছে, তাহা বুঝিবার কোনও সাধনা নাই। দেখিতেছি ধানের খেতের দোলা, আর ঐ আকাশের মেঘের রঙ। কিন্তু তাহার জীবনের পৃষ্ঠা আমাদের আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের,—এই খোস-পোষাকী কর্পূর-সাহিত্যের,—এই শূন্য বিশ্বের দিকে উড়িয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত যে, বিশ্ব-সাহিত্য—তাহার পৃষ্ঠে কিছু ফুটাইতে পারিয়াছ কি? তাহাদের প্রাণের ভাবাভাব, সুখ দুঃখ, তাহাদের যে বিচিত্র রূপের লীলা, তাহা কি কখন একদিনের, এক মুহূর্ত্তের অনুভূতিতে আনিতে পারিয়াছ? বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা ত দূরের কথা—সে সাধনা, সে সাধনের পথে যাহারা যায় নাই, তাহারা তো তাহা কোন রূপেই প্রাণের অনুভূতিতে আনিতে পারিবে না। যদি পারিতে, তাহা হইলে মা'র, এ সাহিত্য-মায়ের অঞ্চলে অমনি সোনা ফলাইতে পারিতে, তোমাদের মানব-জন্ম এমন পতিত জমির কাঁটা ও ঘাসে ভরিয়া যাইত না; আবাদ করিলে সোণা ফলিত। শুধু তাহার আকাশ ও বাতাস তোমার প্রাণে বাঁশী বাজাইত না। তাহার প্রাণের রাগিণী তোমার বাঁশরীতে প্রাণময় সুরের রূপ ধরিয়া দেখা দিত। সুরের আবীর হাওয়ায় হানিতে হইত না। তাহার তীব্র বেদনা আকাশ ফাটাইয়া ফুকারিয়া উঠিত। নকল করিয়া এমন নাকাল হইতে হইত না। জীবন আপনি তোমাদের কাছে ধরা দিত। সাহিত্য ও জীবনে কখন ছলনা চলে না। জীবন লইয়া আজ সাহিত্যের বাজারে যে খেলা চলিতেছে, এ খেলা নয়; নবযৌবনের দলের লীলা নয়; ইহা বিলাতী Coquetry জীবনের সঙ্গে প্রাণের ছলা।

বাঙ্গলার অঙ্গনে এই একটা সুন্দর অদ্ভুত ধারা দেখিলাম। সে

মুসলমানি ধারার পাশে যেমন রামপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাঙ্গলার প্রাণের স্রোতকে অনাবিলভাবে বহাইয়া লইয়া গেছেন, ঠিক তেমনি রামমোহনের সময়ে কবিওয়ালার দল, রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, যজ্ঞেশ্বরী প্রভৃতি বাঙ্গলার খাঁটী কবির দল সেই সুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল। এই কবিওয়ালাদের গানের যুগের কথা আমি আর একবার বলিতে চেষ্টা করিব। কবিওয়ালাদের শেষভাগে ঈশ্বর গুপ্তের যে হাস্যরস, তাহার কথাও কহিব।

এই ফেরঙ্গ যুগের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাণের এক বিরোধ পরিস্ফুটভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। যুগে যুগে সে একবার করিয়া সচকিত হইয়া নিজের মূর্ত্তিকে জাগাইয়া তোলে, মুসলমান যুগেও তাহাই করিয়াছিল আজ ফেরঙ্গ যুগেও তাহাই করিতেছে। একদিকে মুসলমান-ফেরঙ্গ-ধারা আর অন্যদিকে বাঙ্গলার নিজের ধারা। কবে মাটী আবার সেই ধারার মূর্ত্ত পুরুষকে জনম দিবে, তাহারই আশায় বসিয়া আছি।

অন্ধকার আকাশ, আকাশে তারা নাই, দেশবাসী অসহ্যরূপে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে তমসাচ্ছন্ন অবসাদ। একদিকে এই অরূপের বিশ্ব-মোহ, তাহার সে জ্ঞান নাই, তাহার ভবিষ্যৎ নাই, অতীত নাই—সব গিয়াছে। সংসার জ্বালাময়! সমাজ উচ্ছৃঙ্খল, কোথায় বাঙ্গলার আত্মা! জাগরিত হও, বল—সমস্বরে এই মন্ত্র পাঠ কর, বল এইরূপ আমার, এই প্রাণ আমার। বল আমার অদৃষ্ট আমিই গড়িব। আমার জীবন আমিই গড়িব, আমার সাহিত্য আমিই রচনা করিব। গ্রহ-নক্ষত্রে জ্যোতিষ্কের দূরাগত পদধ্বনি কাণে আসিতেছে, বাঙ্গলা এ মিথ্যা রূপক ত্যাগ করিবেই করিবে। হে বাঙ্গলার সন্তান! মুখ তোল, সত্যকে—জীবনকে মুখোমুখি দেখ, ভাল করিয়া পরিচয় করিয়া লও, দেখ, ওই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে, বিশ্বাস ও প্রেম বুকের ভিতর, ভবিষ্যৎ আমাদেরই।

রূপান্তরের কথা

রস বিচারের বিষয় নহে, অনুভূতির বস্তু। কল্পনায় যাহার উন্মেষ, সত্যে তাহার প্রতিষ্ঠা। জীবনে তাহার চরম অনুভূতিই জীবনের ধর্ম্ম। কল্পকলা সেই রসের অনুভূতিকে রূপের আশ্রয়ে প্রকাশ করে। বিচিত্র রূপে, বিচিত্র বর্ণে, গন্ধে, সুরে, মহাভাবের আবেশে কি আভাষে, মানুষের জীবন-কুঞ্জে তাহার স্ফূর্ত্তি হয়। এই জীবনের রূপ ও রঙের খেলার মাঝে প্রাণ-নিকুঞ্জে যে দিন বাঁশী বাজিয়া উঠে, সে দিন সে মুহূর্ত্তেই সুন্দর মধুর রূপে বিশ্ব ভরিয়া যায়, আর অনেক দিনের অন্ধকারের অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়ে। জীবনের এই যে অনেক দিনের জড়তা, তাহা নির্ব্বিষ খোলসের মত পড়িয়া থাকে; বিশ্ব-প্রকৃতি মধুর রূপে হাসিয়া চায়। এক আত্মা মহা-ইন্দ্র-সম সহস্র কটাক্ষে দেখে, জগতে সুন্দর-কল্যাণ, মধুর-মঙ্গল গ্রহ-নক্ষত্র, ঋতু-কাল-মাস-বর্ষ, তৃণ-গুল্ম-বৃক্ষ-লতা, নদ-নদী, শ্যামায়মান প্রান্তর অভ্রভেদী হিমালয়, তরঙ্গ-চঞ্চল বিশাল সাগর সেই একই রূপের রূপবৈচিত্র্যে আপনার আত্মবিকাশ করিতেছে।

বাঙ্গলার গীতিকবিতায় আমি সেই আত্মবিকাশের কথাই বলিয়াছিলাম। সেই রূপান্তরের কথা, সেই রূপ হইতে রূপে বিলাস-বিবর্ত্তের কাহিনী, সেই মহাভাবের সাধনা, সেই সার্ব্বভৌমিক কল্পকলার প্রতিষ্ঠার কথাই কহিয়াছিলাম।

যে আলো লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, সে আলোক যে আমার প্রাণে জাগিয়াছে। মরমের 'মণিকোটায়' নিজের যে লুকান আলোক জ্বলিয়া উঠে, তাহাকে ত' চাপিয়া রাখা যায় না। আত্মা যে

আপনার বিকাশ আপনি আপনিই করে। তাই সেই প্রদীপ হাতে করিয়া ঘরে ঘরে প্রাণের দুয়ারে দুয়ারে সেই নিভান দীপগুলি জ্বালাইয়া দিতে চাই। আমি কানে যে সুর শুনিতেছি, সে সুর আমার দেশ-বাসীকে আমি শুনাইতে চাই। যে প্রদীপে আমার প্রাণ জ্বলিয়াছে, সে প্রদীপ আমার বাঙ্গলার ঘরে ঘরে জ্বালাইতে চাই। বাঙ্গলা আপনার আত্মবিকাশ আপনি করিবে, আপনার গান আপনি গাইবে, আপন সাধন দ্বারা সেই সিদ্ধি লাভ করিবে ও আপন গৌরবে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইবে। আমিই দেখিব, আমাদের ঘরে ঘরে সেই প্রদীপ জ্বলিতেছে; আমরাই শুনিব, সেই বাঁশরী কত বিচিত্র রাগিণীতে বাজিতেছে। তোমার প্রাণের উজ্জ্বল ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া চল, দেখিবে, তোমারই আকর্ষণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে; দেখিবে, তোমারই আলোকে চন্দ্র-সূর্য্য আলোকিত হইতেছে। চাই শুধু—প্রাণের আন্তরিকতা, চাই শুধু—জীবনকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলদ্ধি করা, চাই শুধু—আত্মার দীপ হাতে করিয়া প্রতি পদক্ষেপ গণনা করিতে করিতে পথ চলা!

আমি শুনিয়াছি, আমার কথাগুলি নাকি অনেকে বুঝিতেই পারেন নাই। আজ আমি সেই কথাগুলি আরও ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমার বাঙ্গলা কেমন করিয়া সুখে দুঃখে সোহাগ-আবেগে নিত্য নূতন হইয়াছে, বিচিত্র হইয়াছে, রসের সঙ্গে রসের মিলন ও বিরোধে কেমন করিয়া মরা বাঙ্গালী গান গাইয়াছে, তান তুলিয়াছে, সেই গানের কতটা খাঁটি, কতটা মেকি, তাহারই কথা বলিয়াছিলাম। চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলার গীতিকবিতার ধারা কেমন করিয়া বহিয়াছিল, মহাপ্রভুর জীবনের মধ্যে কেমন করিয়া তাহার অপূর্ব্ব বেগ ও স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, কেমন করিয়া আবার সেই ধারা, মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতায় কি আকার ধারণ করিয়াছিল, আবার

সেই ধারাই কবিওয়ালাদের গানের মধ্যে কেমন করিয়া মধুর জ্যোৎস্না-প্লাবিত ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীর মত বহিয়া গিয়াছিল—সেই গীতিকবিতার ছবি আঁকিতে আঁকিতে ও সেই ধারাকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার জন্য 'রূপান্তরের' কথা বলিয়াছিলাম। আজ আমি সেই রূপান্তরের প্রাণধর্ম্মের কথা শুনাইতে চাই।

কিন্তু সাধারণ জ্ঞান ও ন্যায়শাস্ত্রের তর্কবিতর্কের ঘোর মোহজাল রচনা করিলে নিজের জালে নিজেই আবদ্ধ হইতে হয়। যাহা চাই, তাহাকে প্রাণ ভরিয়া বুকের ভিতর টানিয়া লওয়া সহজ,—শুধু তর্কে তাহাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। জীবনের রসানুভূতির ভিতর দিয়া তাহাকে পাইতে হয়। আপনার প্রাণের মধ্যে চাহিয়া থাকিতে হয়, তাহাদের সঙ্গে স্নেহ চাই, শ্রদ্ধা চাই, ভক্তি চাই, প্রেম চাই। তাহা না হইলে, যাহাই বলি না কেন, যত তর্কই করি না কেন, যাহা চাই, তাহা কিছুতেই মিলে না। এই তর্ক-যুক্তি কথা-কাটাকাটিতে যাহা পাওয়া যায়—ইহ বাহ্য! তাই মীরাবাই গাইয়াছেন—

"বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা"

আমি দার্শনিক নহি, বিজ্ঞানবিদ্‌ নহি,—আমি প্রাণধর্ম্মের ধর্ম্মী। আমি সেই প্রাণ-চিন্তামণির আলো লইয়া ঘুরিতেছি—সেই কাব্যলোকের কথাই বলিতে চাই। রূপান্তরের কথা সেই কাব্যলোকের কথা। সে কাব্য-লোক প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে। সে লোক যে মধুর উজ্জ্বল! জীবনের ধারায় প্রাণকে খুঁজিতে খুঁজিতে, যে দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সেই মুহূর্ত্তেই রূপান্তর হয়। আমার এই প্রাণ যখন জাগরিত হইয়া মহাপ্রাণের আলোকে নিজেকে জ্যোতিষ্মান্‌ করিয়া তুলে, সেই মুহূর্ত্তেই আমার নিজের সত্য পরিচয়-লাভ হয়। সেই কথাই রূপান্তরের কথা,—ইহাই প্রকৃত কবিতার কথা।

কথাটি আরও বুঝাইয়া বলিতে হয়। একটি ফুল যখন ফুটিয়া উঠে মনের সাধারণ অবস্থায় শুধু চক্ষু দিয়া দেখিলে একটি রূপ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সেই রূপ কি ফুলের প্রকৃত রূপ, সমগ্র রূপ? ফুল কি শুধু একদিনে এক মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠে? তাহার মধ্যে কি জন্মজন্মান্তরের কাহিনী লুক্কায়িত নাই? কত কাল ধরিয়া সে যে আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছিল—কতবার ঝরিয়া ঝরিয়া আবার ফুটিয়া উঠিল! কে তাহা গণনা করিবে। তাহার রঙের প্রতিরেখায় যে অনন্তকালের ছাপ, তাহার প্রত্যেক পাপড়ীর মধ্যে যে অনন্তকালের সুখ-দুঃখ জড়াইয়া আছে, তাহার প্রত্যেক কাঁটার মধ্যে যে অনন্তকালের বিরহবেদনা জাগিয়া আছে! ফুল ত' শুধু ফুল নয়, সে যে সকল বিশ্বের যে মহাপ্রাণ, তাহারি প্রাণ-কণিকা সে যে অনন্ত লীলাময়ের লীলা-সহচর! তাহার মধ্যেও যে বিশ্বরূপ জাগিয়া আছে। সকল বিশ্ব যে প্রাণময় সকল রূপ যে চিন্ময়! সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে একমেবাদ্বিতীয়ম্! সকল জীব-জন্তু, তরু, লতা, সকল পদার্থ—যাহাকে তুমি অচেতন ভাবিয়া হেয় জ্ঞান কর, সবই যে সেই এক মহাপ্রাণে অণুপ্রাণিত, সবই যে একই চিন্ময়, অনন্তরূপে উদ্ভাসিত! ফুলও অনন্ত! তুমিও অনন্ত! তুমি যদি তোমার মনগড়া সাধারণ জ্ঞান কি বিজ্ঞানেব ঠুলি চোখে পরিয়া ফুলের এই অনন্ত রূপ না দেখিতে পাও, তাহাতে কি ফুলের স্বভাব, কি ধর্ম্ম বদলাইয়া যাইবে?

শুধু চক্ষে যাহা দেখি, তাহা ফুলের সাধারণ রূপ। আবার সেই ফুল, যখন আমি তাহাতে ডুবিয়া তন্ময় হইয়া প্রাণ দিয়া দেখি, যখন সেই ফুলটী আমার ধ্যানধারণার বিষয় হইয়া উঠে, আমার রস সাধনার মূর্ত্তি হইয়া জাগে, তখনই ত' আমার প্রাণের সাক্ষাৎ লাভ করি। তখন দেখিতে পাই, আমার প্রাণ যে অতল অনন্ত, আর আমার ফুল যে আপন

গৌরবে তাহার বিশ্বরূপে, চিন্ময়রূপে, অনন্ত হইয়া আমারি প্রাণের মধ্যে ফুটিয়া আছে! তাহার সঙ্গে রসের লীলা চলিতেছে—তখনই রূপান্তর।

আমাদের সকলের জীবনেই এইরূপ রূপান্তর ঘটে বা ঘটিতে পারে। একটি নারী-মূর্ত্তি দেখিয়াই প্রথম প্রেমের উন্মেষ হয়। প্রেম জাগিবার আগে সেই নারীর যে রূপ দেখিয়াছিলাম, তাই কি তার যথার্থ রূপ? অনুরাগের অবস্থায় যখন তাহাকে দেখি, তখন যে প্রাণ দিয়া দেখি! তখন যে আমার প্রাণকে দেখিতে পাই এবং সেই প্রাণের যে চক্ষু, সেই চক্ষু দিয়া তাহাকে দেখি! তখন যে—

স্রোতে ভাসা দেহ মন তরঙ্গ-মুরতি!
সকল চাঞ্চল্য-ভরা অচঞ্চল গতি
ফুটিয়া উঠিল সেই—চিরদিন তরে—
আমার বক্ষের মাঝে পঞ্জরে পঞ্জরে!

যতই আমরা প্রাণের সাক্ষাৎ পাই, ততই যে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি চিন্ময়ী হইয়া উঠে! অনুরাগ গাঢ় হইলে—

আমি যে হেরিনু তব নিত্য মধুরূপ—
প্রাণ-স্রোতে টলমল পদ্ম অপরূপ!

তার পরে সেই মূর্ত্তি যে আমার ধ্যান-ধারণার বিষয় হইয়া পড়ে!

সেই—সেই তরঙ্গিত পরাণ-মুরতি
সকল চাঞ্চল্য-ভরা অচঞ্চল গতি।
সকল লাবণ্যে গড়া রূপে ঢল ঢল
পরাণ-তরঙ্গে সেই স্থির শতদল!
সঘন গগনে থির চপলার মত
উজলি জীবন মোর জ্বলে অবিরত!

সকল রকম মাঝে সব কামনায়
সকল ভাবের মাঝে সব ভাবনায় !—
সকল ঘুমের মাঝে সব চেতনায়,
সকল সুখের মাঝে সব বেদনায়,
সকল স্বপন মাঝে সব সাধনায়—
সকল ধ্যানের মাঝে সব ধারণায় !

তখন স্পষ্ট দেখিতে পাই, যেই শুভক্ষণে তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম, সে যে আমার মাহেন্দ্রক্ষণ—সেই মুহূর্ত্তই যে আমার জীবনের অনন্ত মুহূর্ত্ত! আমি আমার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তাহারও সাক্ষাৎ পাইয়াছি !

সেই যে মুহূর্ত্ত মোর, তুমি মূর্ত্তি তার
নহ মিথ্যা ! সত্য তুমি ! সত্যরূপাধার !
অখণ্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর
রূপ-রস-গন্ধ-ভরা আত্মার মন্দির !
পদতলে কলকলে কাল উর্ম্মিমালা
শিরে কোন্ দেবতার নিত্য দীপ জ্বালা !

তখনই মনে হয় যে, এই প্রেম যে অনন্তের পথে যাত্রা করাইয়া দিয়াছে। একটা অপূর্ব্ব শুদ্ধ পবিত্রভাবে প্রাণমন ভরিয়া যায়। মনে হয়, কোথায় কাহার সন্ধানে চলিয়াছি। যাহাকে দেখিয়া প্রেমের উন্মেষ হয়, সে যেন কোন্ মহাদেবতার জাগ্রত জীবন্ত বিগ্রহ। কাহার উদ্দেশে অভিসার করিয়াছি, কোন্ মহাসাগরের দিকে আমার জীবন-নদী বহিয়া চলিয়াছে। তখনই বাঞ্ছিতকে বলি,—

রাখ বুকে বুক কর গো হৃদয়ঙ্গম
প্রাণ-গঙ্গা মোর কোন্ সাগর-সঙ্গম
পানে বহে চলিয়াছে, কার পিছে পিছে
শুনি কার শঙ্খধ্বনি—

তার পর এই প্রেম যখন আরও গাঢ় হয়, তখন প্রাণের দুইটি তীর ভাসাইয়া দেয়, এবং সেই স্রোতের মধ্যে কত কি জাগিয়া উঠে! তখনই গাহিয়া উঠি,—

যে ফুল ফোটেনি কভু, তারি গাঁথা মালা
যে দীপ জ্বালেনি ওরে! সেই দীপ জ্বালা
অন্তরের অঙ্গে অঙ্গে
কে দিল বুলায়ে রঙ্গে?—
যে ফুল ফোটেনি আগে
সেই ফুলে গাঁথা মালা!
এই যে হৃদয় মাঝে
কি সুন্দর কুঞ্জ রাজে!—
যে দীপ জ্বলেনি আগে
ওরে! তারি আলো জ্বালা।

তার পরেই মনে হয়, এই যে প্রেমের খেলা, এ যেন তিন জনের খেলা—একজনের লীলা। সেই একজনের চরণ-নূপুরের রুণুরুণি প্রাণের মধ্যে শুনিতে পাই। সে যে হাসিয়া হাসিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া আমার প্রাণের মধ্যে নাচে। এই প্রেমের যত না মাধুর্য্য সবই সবই যেন নিজে আস্বাদ্ করে। আমরা যেন তাঁহার পাশে দাড়াইয়া তাঁহার আনন্দ-মন্দিরে তাঁহারি ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিই। তখন আমাদেরও প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। তখনই প্রেমিক গাহিয়া উঠে,—

ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি জানি জেগেছে,
হৃদয়-কমল-মাঝে কি ধুম লেগেছে

* * * *

কে নেয় রে মধু মিটি
হেসে হেসে কুটি কুটি ?
তালে তালে মধু ঢালি
কে দেয়রে করতালি ?

ওরে দেখ্ দেখ দেখ্ কিধূম লেগেছে
পরাণ- কমল মাঝে কি জানি জেগেছে !

যখন দেখিলাম, হৃদয়ের মাঝে "কি জানি জেগেছে", পরেই দেখিলাম "কে জানি জেগেছে।" তখনই উপলব্ধি করিলাম যে, এ প্রেম ধন্য, তখনই আমার যে প্রেমের সহচর, তাহার দিকে চাহিয়া গাহিয়া উঠিলাম,—

ওগো ফুল ! ওগো মিষ্টি !
ধন্য ধন্য সব সৃষ্টি !
ধন্য আমি, ধন্য তুমি,
পূণ্য সে মিলন ভূমি !

তখন যে আমার হৃদয়বিহারী করতালি দিয়া ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন আমি আবার গাহিলাম,—

কে বলে রে ধন্য ধন্য ?
কে দেয় রে করতালি ?
তোমার আমার মাঝে
অপর কেহ কি আছে ?
কে বলে রে ধন্য ধন্য
এ কার নূপুর বাজে ?

কার পদরজঃ
পরাণ-পঙ্কজ
শোভা করে ?—

তখনই কি প্রেমিক তাহাকে দেখিতে পায় ? তখনও নহে। এই প্রেম-ব্রত উদ্‌যাপন না করিলে তাঁহাকে দেখা যায় না। এই প্রেম ব্রত উদ্‌যাপন করিতেই হইবে। সকল জীব যে—

"ঠেকে গেছে প্রেমের দায়"

এক জন্ম হউক, অসংখ্য জন্ম হউক, এই ব্রত উদ্‌যাপিত হইবেই হইবে ! যখন সেই শুভক্ষণে প্রেমিক দেখিবে, তাহার চোখের কাছে প্রানের মধ্যে, তাহার অন্তরে বাহিরে দুই বাহু বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার হৃদয়ের হৃদয়বিহারী চিন্ময় চিদানন্দে পূর্ণ আনন্দরূপ বন রসামৃত-স্বরূপ তাহারই প্রেমের প্রেমিক ভগবান্ !

এই যে প্রেমের কতকগুলি অবস্থা নির্দ্দেশ করিলাম, ইহার প্রত্যেক অবস্থাই রূপান্তরের অবস্থা, শেষ অবস্থার কথা যাহা বলিয়াছি, তাহাই রূপান্তরের চরম। এই প্রত্যেক অবস্থাই সত্য, এই সমস্ত অবস্থা লইয়াই প্রেমের রাজ্য।

সেই প্রথম যখন রূপ আসিয়া চোখের সাম্‌নে দাঁড়াইল, সেই অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সেই শেষে যখন সকল রূপের যিনি স্বরূপ, তিনি আসিয়া প্রাণের সম্মুখে প্রাণের মধ্যে দাঁড়াইলেন—এই সব লইয়াই যে প্রেম, এই সব লইয়াই একটি অখণ্ড সত্য-রাজ্য। ভগবান্ যে বাঁশী বাজাইয়া তাঁহার নিকট ডাকেন। আমরা ভুলিয়া যাই যে, ইন্দ্রিয়ের ডাকও সেই ভগবানের ডাক। ইন্দ্রিয়-জগতে যে প্রেমের আরম্ভ, অতীন্দ্রিয়-জগতে তাহার পরিণতি। ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মই এই যে, সে আঙ্গুল দিয়া অতীন্দ্রিয়ের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এই যে অখণ্ড সত্য-

রাজ্য, ইহার কোন অংশই বর্জ্জন করা যায় না,—করিলে সত্যের অঙ্গহানি হয়। এই সমগ্র সত্যটি যখন আমাদের প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠে, তখনই আমাদের সাধারণ জ্ঞানের যে প্রেম, তাহার রূপান্তর ঘটে। প্রেমের যে স্বভাব, তাহার পরিবর্ত্তন হয় না, শুধু আমাদের চোখ খুলিয়া যায়, প্রেম আসিয়া আমাদের কাছে ধরা দেয়। যে কবির প্রাণে এই সমগ্র অখণ্ড সত্যের প্রদীপ জ্বলিয়া না উঠে, তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা অসম্ভব।

কেহ কেহ বলেন যে, কল্পকলার সাধনা এ জীবনে শুধু বিলাসের জিনিষ, ইহার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা ধর্ম্ম অর্থে ইংরাজেরা যাহাকে religion বলে, শুধু তাহাই বুঝেন। আমরা জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিতে শিখি নাই, আমাদের ধর্ম্ম জীবনের কোন একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। আমরা জানি ও বুঝি যে, সকল কল্পকলার ভিত্তি রস-সাধন, সকল কল্প-কলার উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি! সুতরাং সকল রসের আকর যে রসময়, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে কোন রস-সাধনই সার্থক হইতে পারে না। রস-সাধন না হইলে রসসৃষ্টিও বিড়ম্বনা। বিলাসের ধর্ম্মই এই যে, সে শুধু ইন্দ্রিয়-গ্রামে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সে যে আপন বিলাসের বিষয় লইয়া তন্ময় হইয়া পড়ে ও আপনার আবেগে ইন্দ্রিয়রাজ্য অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয়-রাজ্যে পৌঁছায় এবং সেইখানে তাহার রূপে রূপে রসে রসে বিলাসবিবর্ত্ত! মহাপ্রভু রামানন্দের মুখে এই বিলাসবিবর্ত্তের কথাই শুনিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং যাঁহারা শুধু ইন্দ্রিয়রাজ্যের যে বিলাস, তাহার মধ্যে অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের খোঁজ পায় না, সেই রূপে রূপে রসে রসে বিলাস-বিবর্ত্তের সন্ধান রাখে না, শুধু ইন্দ্রিয় রাজ্যের মধ্যে বিলাসকে আবদ্ধ করিয়া সেই বিলাস লইয়া একটা মন-গড়া অসার কাল্পনিক জগৎ

সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে কলাকলার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাঁহাদের আমি তর্ক করিয়া কিছুই বুঝাইতে পারিব না—শুধু বলিব, এই যে বিলাস, যাহার একদিক্ দেখিতেছ, অপর দিক্ দেখিতে পাইতেছ না—ইহ বাহ্য!

আবার কেহ কেহ বলেন, ইন্দ্রিয়গ্রামের কথা তুচ্ছ নিম্নস্তরের কথা, কলাকলায় তাহার স্থান নাই। ইন্দ্রিয়ের বিষয় কলাকলার রাজ্যে প্রবেশ করিলে কলাকলা অপবিত্র হইয়া যাইবে, আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। নীতির কথা বল, তত্ত্বের কথা বল, মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে যাহা আছে, সব কাটিয়া ছাঁটিয়া দাও, ইন্দ্রিয়ভোগের যে স্পৃহা, তাহার নাম মুখে আনিও না, মানুষকে দেবতা করিয়া তুল, কলাকলার দোহাই দিয়া জীবনকে অপবিত্র করিও না। জীবনকে অপবিত্র করে কাহার সাধ্য? জীবের জীবন যে ভগবানের লীলা,সেই লীলাময়ের লীলার উপরে হস্তক্ষেপ করে, এমন অহঙ্কার—এমন দাম্ভিকতা কার? মানুষ কি এই পর্দ্দাঘেরা নীতি-কথা বুকে বাঁধিয়া মিথ্যার উপর দাঁড়াইয়া মিছামিছি বিনাকারণে দেবতা হইয়া উঠিবে? মানুষের প্রবৃত্তি কি সত্য নহে? মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে কি ভগবানের সাড়া পাওয়া যায় না? আজও কি চৈতন্যের দেশে এ কথা শুনিতে হইবে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের খেলা সয়তানের খেলা? আমরা কি ইংরাজী আমলের প্রথম অবস্থায় যাহা মুখস্থ করিয়াছি, তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না? ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কি অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান মিলে না? ইন্দ্রিয় যে অতীন্দ্রিয়ের ভিত্তি ইন্দ্রিয়ের রাজ্য একেবারে ছাড়িয়া দিয়া একটা মনগড়া শুদ্ধ পবিত্র-লোকের প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়াও যেমন, শূন্য-আকাশে গৃহ-নির্ম্মাণের চেষ্টাও ঠিক সেইরূপ! মিথ্যা কল্পরাজ্যে তাহা স্থান পাইতে পারে, সত্য-রাজ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। এমন হতভাগ্য কি কেহ আছে যে,

তাহার ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ, তাহার মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের যে ডাক একেবারেই শুনিতে পায় নাই? কাহারও প্রাণে সেই বংশীধ্বনি খুব স্পষ্ট হইয়া বাজিয়া উঠে, কাহারও প্রাণে খুব ক্ষীণ ও অস্ফুটভাবে ধ্বনিত হয়; কিন্তু একেবারে শুনিতে পায় না, এমন হতভাগ্য কি কেহ আছে? যদি থাকে, তবে আমাকে বলিতেই হইবে যে, তাহার জীবনের কোন অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। সে কতকগুলি নিয়ম মুখস্থ করিয়া বসিয়া আছে জীবনের কোন সন্ধান পায় নাই। সে যেদিন সেই নিয়মগুলি ভুলিতে পারিবে, সে দিনই প্রথম সত্যরাজ্যে পদক্ষেপ করিবে। সে পর্য্যন্ত তাহার জন্য কোন কল্পকলার রসসৃষ্টির প্রয়োজন নাই। তাহাকেও আমি কোন যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝাইতে পারিব না। যে দিন লীলাময় আপনি বুঝাইবেন, সে দিন বুঝিবে। এখন শুধু মহাপ্রভুর ভাষায় এইটুকু বলিয়া রাখি,—ইহ বাহ্য!

কেহ কেহ বলেন, মানুষকে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাকে কাজের লোক করিয়া তুলিতে হইবে, সাধারণে যাহাতে তত্ত্বকথা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে, জনসাধারণে যাহাতে তাহার প্রচার হয়, কল্পকলার বিষয়কে এমন করিয়া গড়িতে হইবে। তাহাদেরও উত্তর—ইহ বাহ্য!

আবাব কেহ কেহ বলেন, সমাজের সংঘাতে যখন ব্যক্তির জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে, পরাধীন যখন তাহার শৃঙ্খলের ভারে নড়িতে পারে না, তখন কাব্যরস মানুষের প্রাণকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করে; তাহাকে একটা স্বপ্নের ঘোরে লইয়া যায়। এই স্বপ্নের জন্য, জীবনকে এই স্বপ্ন দিয়া তৈয়ারী করিবার জন্য কল্পকলার সৃষ্টি। তাহার :ও উত্তর—ইহ বাহ্য!

কেহ কেহ বলেন, যাহা শুধু হিতকর, যাহা :কোন অশুভ, ক্ষতি,

কোন অমঙ্গল আনে না, তাহাই সুন্দর ও যথার্থ কল্পকলা। তাহাদেরও আমি বলব—ইহ বাহ্য!

কল্পকলা যদি শুধু আমাদের আনন্দ ও আমোদের জন্যই হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাধীন ধর্ম্ম থাকে না, তাহার আত্মবিকাশ হয় না, আমাদের কতকগুলা ভাবের খেয়ালের ছাঁচে পড়িয়া তাহার জীবনের আসল প্রাণটুকু মরিয়া যায়। তাহার কোন সার্থকতা হয় না। সত্য তখনই সুন্দর হয়, যখন তাহার এই বহিরাবরণের ভিতর ছাপাইয়া সে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত ভাবকে বন্ধন হইতে মুক্তি দেয়। মানব-প্রকৃতির গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশের যে প্রাণের খেলা, তাহাই যখন সে প্রকাশ করে, যখন আত্মার নিগূঢ় কথাটি ব্যক্ত হইয়া উঠে, তখনই কল্পকলার রূপসৃষ্টি হয়। বিশ্বের অনন্ত রহস্যময় ঘরের দুয়ার যাহা সাধারণ জ্ঞানে সাদা চোখে বন্ধ থাকে, মানবের সেই 'ভিতর গাঁয়ের' কথা, কাম-কামনার অতীত যে মাধুর্য্য, সেই আত্মার রসভোগের যে ব্যঞ্জনা, বিশ্বশক্তির যে মূর্ত্ত স্ফুরণ, মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির আত্মায় আত্মায় যে রমণ, কল্পকলা তাহারই চাবি,—সেই চাবি ঘুরাইয়া আত্মা নিজের রূপের আদর্শটিকে সেই অনন্ত রহস্যময় ঘরের দুয়ার খুলিয়া বাহির করিয়া আনে।

বিশ্বের যে দিকে নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখি,—দেখি, প্রতি পত্রে প্রতি রঙে, প্রতি রূপে সেই আত্মার প্রতিরূপ। ঋতু আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনে মানবের কার্য্যকারণের সম্বন্ধে, প্রকৃতির বিপ্লব বহ্নিদাহে, মানুষের নিজ-কৃত স্বকপোলকল্পিত নানা শক্তির বিকাশে, এক মহা সুশৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলায় যেন এই বিশ্ব অহরহ আন্দোলিত হইতেছে। আঁখির সম্মুখে বাস্তব সত্য-জগৎ প্রতিভাত, কিন্তু তাহাতে সেই অন্তরতমের যে রূপ, তাহা আমাদের চোখে পড়ে না। কল্পকলা সেই অন্তরের রূপটিকে বিশ্বের

বুকের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করে, যাহা মায়া বলিয়া ভ্রম হয়, তাহার সত্যরূপকে জাগাইয়া দেয়। যাহা এমনি আমাদের চোখে পড়ে, যাহার ভিতর সেই অচিন্ত-দ্বৈতাদ্বৈতের রহস্য আমাদের কাছে প্রকাশ হয় না, কল্পকলার সেই সত্যকে মনের কাছে জীবন্ত জাগ্রত করিয়া ধরিয়া দেয়। রূপ,রস, শব্দ,স্পর্শ, গন্ধের ভিতর দিয়া আমাদের প্রাণের কাছে সেই সত্যকে আনিয়া দেয়। রূপে রূপে রসে রসে যে লীলা, তাহার ধ্যানগত অনুভূতিই কল্পকলার বিভূতি। কল্পকলাবিদ্ সেই বিভূতি দর্শন করেন। যাঁহারা সত্যের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে ভাল করিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সঙ্গে পরানুরক্তির আসক্তি জাগিয়াছে, যাহাদের চিত্ত সর্ব্বভাবে সেই পরানুরক্তিতে ভিজিয়া গিয়াছে, যাঁহাদের ভাব সেই রসের মধ্যে গাঢ়তা লাভ করিয়াছে, সেই প্রাণ-মন-দেহ দিয়া অনুধ্যান, সেই অহৈতুকী সান্নিধ্যলাভের জন্য যাঁহাদের প্রাণ প্রেমরসে বিভোর হইয়াছে, তাঁহারই কল্পকলার স্রষ্টা।

মনের যে আকাঙ্ক্ষা, সে সত্য বস্তুকে সুন্দর করিতে চায়। শুধু তাহার একটা ভাবের আভাষে প্রাণ ভরিয়া উঠে না, তাহাতে সে তৃপ্ত হয় না। সেই রূপরসের ভিতর দিয়া মূর্ত্তিকে ধরিতে চায়, তাহাতে দোষ হয় এই যে, বস্তু তাহার নিজের স্বাধীন ভাবকে প্রকাশ করিতে পারে না। সে তখন আমার আকাঙ্ক্ষার, কামনার ভোগ্য দাস হইয়া দাঁড়ায়। তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিতে বাধা পায়। তাই তখন আর সুন্দর থাকে না। বস্তুর যে নিজের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও গতি আছে, তাহাই তাহার বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য, আর সেই জন্যই তাহা সুন্দর। সে যে রস জাগাইয়া দেয়, তাহাই সুন্দর। তোমার আমার মনে যে রসের অনুভূতি হয়, তাহার সঙ্গে সেই বস্তুর রসাঙ্গসমূহ মিলিত হইয়া আমার প্রাণের কাছে এমন একটি রূপের দ্বারা রসের আভাষ জাগায়—যাহা সুন্দর—অতি সুন্দর!

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত' জড় নয়, জড়তা আমার মনের মধ্যে ; তাই এই চিন্ময় ধামের রূপ-মাধুর্য্যের ভিতর সুন্দরকে ব্যভিচারী দোষে দুষ্ট করিয়া জড় বলি। অঙ্গ-সমূহের যখন অঙ্গাঙ্গিভাবে যাহার যথাযোগ্য সন্নিবেশে রূপসৃষ্টি হয়, আর সেই রূপের ভিতর তাহার আত্মার মধুর রসটি জাগিয়া উঠে, তখনই তাহা সুন্দর। তাই সুন্দরের জন্য প্রাণ এমন ব্যাকুল হয়। কাব্য সুন্দর হইতে হইলে কাব্যের প্রাণের রসেই তেমনই স্বাভাবিক ভাবের মিলন হওয়া চাই। যখন মনকে রসের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, তখনই সুন্দর, সুন্দর হয়। এই সুন্দরকে প্রকাশ করিবার জন্যই কল্প-কলার সৃষ্টি। মানব অন্তঃকরণের ভিতর যে ভাবরাশি ঘুমাইয়া থাকে, মানুষের মনে যে গভীর জটিল রহস্যগুলি লুকাইয়া লুকাইয়া আপনি খেলা করে, তাহার প্রাণের ভিতরে যত সঙ্কল্প-বিকল্প, যত তৃষ্ণা, যত দ্বৈতের জঞ্জাল, দৈন্য-বিরোধ, যত মিলন-সোহাগের মাধুর্য্য, তাহার বেদনা, তাহার যাতনা, তাহার রাগ অনুরাগ, তাহার ভাব অভাব, মহাভাব এই সব দিয়া আমাদের সমগ্র জীবনের যে অনুভূতি, জীবনচক্রের এই মহা-পরিধির ভিতরে মানুষ যেমন করিয়া বাঁচে, যেমন করিয়া মরে, —এই জাগ্রত ভাবের রূপ ধরিয়া সৃষ্টি করাই কল্পকলার উদ্দেশ্য। আর সেই রূপের ভিতর দিয়া সচ্চিদানন্দ-ঘন-চিন্ময় কেমন প্রতিরূপ হইয়া ভাঙ্গা-গড়ার লীলা লীলায়িত ভাবে আমাদের প্রাণ-মন-দেহ দিয়া সাধন করিতেছেন, তাহারই প্রকাশ করা, সুন্দর করিয়া মধুর করিয়া তোলাই কলাবিদের প্রাণের সৃষ্টি-কাহিনী।

কেহ কেহ বলেন, কল্পকলার সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টি অপেক্ষা হীন। কারণ, প্রকৃতিতে জীবন উদ্‌বুদ্ধ, মানবের সৃষ্টিতে তাহা মৃত, প্রকৃতিতে তাহা সজীব জীবন্ত! কল্পকলার উপাদান হয় কাঠ, নয় পাথর, নয় মাটী, নয় মোম, নয় কথা, নয় সুর। এ সব পদার্থও যে সত্য, মৃত নয়, ইহাদের

মধ্যেও মহাপ্রাণ জাগিয়া আছে! কিন্তু শুধু এই সব উপাদান দিয়াই ত কল্পকলার সৃষ্টি হয় না। আত্মার অনুভূতি দিয়া সেই সৃষ্টির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সেই অনুভূতিতে যে মহাজীবনের আভাস, তাই এই সব কাঠ-পাথর অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া পড়ে! জীবনের মধ্যে যে সত্য আমরা চোখের কাছে ধরিতে যাই, প্রকৃতির বুকে যে সব সৃষ্টি আমরা জীবন্ত বলিয়া দেখি, কল্পকলা তাহাই ধরিয়া নব নব রূপে জীবিত জ্বলন্ত সত্তার ভিতর দিয়া সৌন্দর্য্যের স্বরূপটি ধরিয়া দেয়। সেই জন্য কল্পকলায় সৃষ্টিও শ্রেষ্ঠ! কিন্তু—ইহ বাহ্য! এ সকল কথা সার্ব্বভৌমিক কল্পকলার কথা নয়। প্রকৃতি যে আদর্শে আপনার বুক হইতে রূপের সৃষ্টি করে, মানুষও সেই একই আদর্শে তাহার প্রাণ হইতে রূপ সৃষ্টি করে। এই উভয় সৃষ্টিই যে সেই লীলামৃত-রসাধার সেই আনন্দ-ঘন মহান্‌-রসরাজের লীলাভঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছে। কেহ হীন নয়, কিছুই হীন নয়।

কবীর গাহিয়াছেন—

"আপুহি সবমে রমা হৈ,
আপ সবনকে পার।
রূপ রংগ সব আপুহী,
আপুহি সিরজন হার॥
আগে বহুত বিচার ভৌ,
রূপ অরূপ ন তাহি।
বহুত ধ্যান করি দেখিয়া,
নহি তহি সংখ্যা আহি।"

আপনি সৃজন করিয়া আপনিই হরণ করিতেছেন। সকলের ভিতরেই তিনি আছেন, সকল রূপের মধ্যেও তিনি। রূপ ও রঙের যে রঙ্গ, যে লীলা, এর ত' সংখ্যাসীমা নাই। জীবনে যাহাদের রূপের পরিচয় ভাল

করিয়া হইয়াছে, তাহারাই এই রূপ-রঙের লীলা-মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারে।

অনন্ত রূপের মাঝে এ মন শুধু দু-একটা রূপকেই চিনিতে পারে, ধরিতে পারে, অসংখ্য সুরের হিন্দোল মাঝে একটি সুর হয় ত' আমরা চিনিতে পারি, অসীম জ্যোতিরাশির মাঝে আমরা যেন পতঙ্গবৎ উড়িয়া বেড়াইতেছি। কল্পকলার রূপের ধ্যানে যখন সমাধি হয়, তখন সেই আসল রূপটি ফুটিয়া উঠে! এই সাধনায় সিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

ষড়্‌দর্শনে দর্শন পেলেম না আগম নিগম তন্ত্র সারে।
সে যে ভক্তি-রসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥

কল্পকলার স্রষ্টা সত্য সত্যই এই রূপের ভিতর দিয়া দর্শন করে, স্পর্শ করে। সে মহাভাবের গান তাহার কাণে অহরহ ধ্বনিত হয়। কলাবিদের প্রাণ সেই মহাপ্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আপনি বাজিয়া উঠে। এই বিশ্ব তাহার কাছে এক বিরাট্ আয়নার মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে, কলাবিদ্ সেই আর্শিতে নিজের রূপের প্রতিরূপ দেখিয়া নিজ মাধুরী আস্বাদন করেন। প্রতিরূপের ভিতরেই তাঁহার বিলাস-বিবর্ত্ত ফুটিয়া উঠে, তাঁহার আত্মার রূপ বিশ্বের প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠে, বিশ্বের প্রাণের রূপ তাঁহার প্রাণে প্রতিভাত হয়। এই যে অন্তরে অন্তরে রূপের পরিচয় লাভ করা যায়, তাহাই প্রাণের রূপান্তর!

আমি বলিয়াছিলাম যে, বাঙ্গলার আধুনিক গীতি-কবিতায় সেই প্রাণে প্রাণে অনুভূতি, সেই "স্বাদিতে নিজ মাধুরী" প্রাণের সেই সার্ব্বভৌমিক কল্পকলার রূপান্তর হয় নাই। চণ্ডীদাসের গানে, রামপ্রসাদের গানে যে রূপান্তরের পরিচয় পাওয়া যায়, আধুনিক কবিদিগের কবিতার মধ্যে তাহা পাওয়া যায় না। তাহার কারণ আছে। গীতিকবিতার

প্রাণ কবির আত্মানুভূতিতে ও আত্মস্থ অনুরাগের আনন্দে। কবির প্রাণে জীবনলীলার সঙ্গে সঙ্গে যে রূপের পরিচয় কবি লাভ করেন, তাহার আত্মার নিগূঢ় কথাটি, মর্ম্মটি প্রকাশ করিয়া তোলাই গীতি-কবিতার ধর্ম্ম। কথাটি অপ্রিয় হইলেও আমাকে বলিতে হইবে, বাঙ্গলার আধুনিক গীতিকবিতায় সে জিনিষটা পাওয়া যায় না। এই যে শত-বর্ষব্যাপী আমাদের আধুনিক সাহিত্যে গীতিকবিতার বিরাট্ আয়োজন, ইহা আমাদের জীবনের কোন কর্ম্মই, কোন সাধনাকেই সার্থক করে নাই, কোন সত্যকেই সুন্দর করিয়া আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া চোখের সম্মুখে ধরে নাই। এ সেই—

"পিতলকি কাটারি কামে নাই অওল
উপর কি ঝক্‌মকি সার"

এই সমগ্র সাহিত্যই অনুভূতির নয়—মাথার বোঝা। ধার করা—পরের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা আহরণ করা। ইংরাজী সাহিত্যে ও ফরাসী কবিতার তর্জ্জমা হয় ত বা নরওয়ে সুইডেনেরও ছাঁদে গড়া। তাহাতে বাঙ্গালীর প্রাণ নাই, ধর্ম্ম নাই—আছে শুধু অনুকরণ! অনুকরণে কখনও জীবন আসে না, ধার করিয়া কখনও সম্পদ অর্জ্জন করা যায় নাই। এই সাহিত্যও সেই কারণে বস্তুহীন, প্রাণহীন, একটা অসার কাল্পনিক ভাবুকতায় ভরা। বাঙ্গলার প্রাণের সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই।

রূপে ধরা দিবার জন্যই ভাব প্রাণের অন্তরে অন্তরে গুমরিয়া উঠে। ভাব যতই রূপের ভিতর দিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, ততই তাহার সৌন্দর্য্য বাড়ে। ভাব যখন সত্য সত্যই রূপের কাছে ধরা দেয়, তখনই তাহা মধুর ও সুন্দর। সত্য যখন মানব মনে প্রতিভাত হয়, ভাব যখন সেই আকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, তখন সে ভাব

কাল্পনিক নহে, সত্যের অবভাস নয় তাহা সত্যরূপ, তাহাই সত্য মূর্ত্তিমন্ত জলন্ত! সত্যের রাজ্যে নিত্য যে লীলা চলিয়াছে, তাহাতে ভাব ও আকারের পার্থক্য নাই। সে লীলা কাব্যলোকের নিভৃত মিলন কেন্দ্র। আমাদের বিচারবুদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কিন্তু মিলন-মন্দিরে যখন বুদ্ধি সেই রূপের টানে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন তাহার সেই পাটোয়ারী বুদ্ধি রূপসাগরের অতল জলে ডুবিয়া মরিয়া বাঁচে, আর প্রাণ তখনই সত্যকে অনুভব করিয়া একেবারে গ্রহণ করে। যাহা সত্য, তাহাই সুন্দর। যাহা সুন্দর, তাহাই যে অনন্ত, স্বাধীন। যাহা স্বাধীন, তাহাকে তোমার মাপের রশি দিয়া বাঁধিতে পারিবে না; যাহা অনন্ত, তাহাকে তোমার মাপকাটি দিয়া পরিমাণ করিতে পারিবে না।

তাহাকে পাইবার একমাত্র উপায় প্রেম—অখণ্ড অনন্ত প্রেম! ভাব যেমন আপনার ভাবে গলিয়া আকারের ছাঁচে আপনাকে ঢালিয়া দেয়, তেমনি জীবনকে সেই প্রেমে ঢালিয়া দিলে তবেই জীবনের সত্য রূপটি ধরা দেয়। এই প্রেমের সোহাগ-বাঁধন যদি না থাকিত, তবে কি এই যে মহাভাবের অপার আনন্দ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি অনন্ত অভাব, অসীম দুঃখ—এই দুইকে মিলাইতে পারিতাম? যত দুঃখ, যত অভাব, যত যাতনা, যত ঘৃণা, যত হিংসা, সেই প্রেমেরই অন্যরূপে ফুটিয়া রহিয়াছে। এই সবের মধ্যেই যে সোহাগের বাঁধন! এই সবই যে অনন্ত প্রেমের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। যখন সত্য হারাইয়া মেকি লইয়া প্রাণ কাঁদে, তখন সেই অনন্তের পানে মুখ তুলিয়া প্রাণ বাঁচে। জীবনের যদি কোন সংজ্ঞা থাকে, তবে তাহা প্রেম, প্রেমে এই মূর্ত্তি-স্রোতের জন্ম, প্রেমেই এই প্রাণ-স্রোতের চঞ্চলতা। সারা বিশ্ব সেই প্রাণস্রোতে মূ র পর মূর্ত্তি, রূপের পর রূপ, এই লীলা-চঞ্চল-বারিধি-বুকে অবিরাম

প্রাণ স্রোতে টলমল করিতেছে। সেই লীলা-চঞ্চল মূরতি-স্রোতের সঙ্গে প্রাণের নিঃসঙ্গ পরিচয়-লাভই প্রেমের এক দিক। রূপের ভিতর দিয়া প্রাণের এই লীলামূর্ত্তির পরিচয় যখন ধ্যানগত হয়, তখন সেই মূর্ত্তির সহিত অহৈতুকী পরিচয় হয়, তখন সেই নিজের মাধুরী সেই মূর্ত্তি-স্রোতের ভিতর আস্বাদন হয়। তখনই সত্য রূপান্তর। প্রেমের প্রথম জাগরণে রতির রাগানুরাগ জাগে, সেই জাগরণের সঙ্গে নিজের মাধুরী আস্বাদের কামনা, বাসনা, মমত্ব, মদনত্ব জাগে। যখন তাহা প্রেমের ভূমিতে আসিয়া দাঁড়ায় ?—সেই প্রেমের ভূমিতে একবার পা রাখিতে পারিলে অখিল-রসামৃত মূর্ত্তির আভাষ প্রাণে—স্ফটিকে সূর্য্যকিরণ-প্রতিবিম্বের মত স্বচ্ছ হইয়া পড়ে। প্রাণ যখন দর্পণের মত স্বচ্ছ হয়, তখনই আত্মার যে প্রাণময় সৌন্দর্য্য, তাহার স্বরূপকে পাই। তখন বুঝিতে পারি ! সে প্রাণের সত্য অনুভূতিতে, নিখিল রস, রসশেখরের রস-চঞ্চল যে সত্যমূর্ত্তি, তাহাই প্রাণে ফুটিয়া উঠে। সেই ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরের রূপকে সত্যদর্শন হয়, তাহাকে স্পর্শ করা যায়, তখন তাহার গায়ের গন্ধ নাসিকায় ভাসিয়া আসে—প্রাণ-স্রোতের লীলায় তখন সেই ধ্যানগত পদ্ম ফুটিয়া উঠে। কলাবিদের জীবনে, কবির জীবনে, এমনি করিয়া সেই সত্য পরিচয় হয় ! কলাবিদ্ ও কবির রূপান্তর—তাহার দৃষ্টি তাহার প্রকাশ !-- সাধক তাহার সাধনায় সমাধিতে—তাই মিলাইয়া আনন্দ-ঘন-রসে মজিয়া যায় ! এই যে রূপান্তর, ইহা সেই অনন্তের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়লাভ—প্রাণে প্রাণে বুকে বুকে স্পর্শমণি ছুঁইয়া সোনা হওয়া !

আমি বলিতে চাই যে, একমাত্র চণ্ডীদাসের গান ছাড়া বাঙ্গলা গীতি-কবিতার শেষ যুগে রামপ্রসাদের গানে সেই রূপান্তর হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের প্রাণের যে সৌন্দর্য্য, তাঁহার কল্পকলার যে সৃষ্টি, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি মহাপ্রভুর জীবনে হইয়াছিল। মহাপ্রভুর জীবনের মত এত বড় কাব্য আর কখনও রচিত হয় নাই। সাধক রামপ্রসাদ যে রসের আদর্শ আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কাহার জীবনে যে ফুটিয়াছে, এ কথা এখন নাই বলিলাম। চণ্ডীদাসের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল,—তাঁহার সৃষ্টিই তার প্রমাণ। রামপ্রসাদের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল, তাঁহার সৃষ্টিও তাহারই প্রমাণ

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীশশিভূষণ পাল,
মেট্‌কাফ্ প্রেস্;
৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা